আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের-সহধর্মিণী

হে ম প্র ভা দে বী

যিনি আজ পরলোকে, যিনি ছিলেন লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, যাঁহার
ঐকান্তিক উৎসাহে আমার স্মৃতিকথা লিখিতে ব্রতী
হইয়া ছিলাম; কিন্তু কালের করাল গ্রাস যাঁহাকে
অকালে আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া
লইল—আমাদিগকে অনন্ত দুঃখসাগরে
ভাসাইয়া—তাঁহার পবিত্র আত্মার
উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
স্মৃতির অর্ঘ্য-স্বরূপ
প্রদত্ত হইল।

নিবেদন

একজন সাধারণ শিক্ষকের জীবনে রোমাঞ্চকর বা অসাধারণ এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার যোগ্য। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে, যাঁহারা জ্ঞানী, গুণী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী—তাঁহাদেরই জীবনী বলিতে তেমন কিছু নাই, অথচ, পাশ্চাত্য দেশে একজন 'মেকানিক'এরও জীবনী লিখিত হইয়া থাকে, এবং ঐ 'ক্যাচ-পেনী' বাজারে ছাড়িবা মাত্রই হাজার হাজার কপি মাত্র দুই দিন মধ্যে বিক্রয় হইয়া যায়—লেখককে উৎসাহ দিবার জন্যই তাঁহারা একপেনী খরচ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

আমি যে স্মৃতিকথা লিখিয়া গিয়াছি ইহা পুস্তকাকারে ছাপাইবার উদ্দেশ্যে নহে, জন সাধারণের মধ্যে প্রচার বা স্বীয় মহিমা কীর্তনের জন্যও নহে, আমার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অগণিত ছাত্রদের অবগতির জন্য ও নিজের অবসর বিনোদনের জন্য মাত্র। আমি সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছি এবং ঐ শিক্ষক জীবনে বহুলোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি—বহু ঘটনার সাক্ষ্যরূপে এখনও জীবিত আছি (The sad historian of the pensive paean) তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি ইহা কখনও আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের হাতে পড়ে এবং তাঁহাদের অবসর মুহূর্তগুলিতে তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিতে পারে, তাহাতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

আমার আন্তরিক ইচ্ছা ঐরূপ থাকিলেও, পরবর্তী কালে উহার পরিবর্তন ঘটে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীমান পরিমল গোস্বামী আমার পাণ্ডুলিপি আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উহা পুস্তকাকারে ছাপাইলে আমাদের ছাড়িয়া আসা রতনদিয়া গ্রামের 'রেকর্ড' স্বরূপ হইয়া থাকিবে এবং আমাদের উত্তর পুরুষদের নিকট মূল্যবান দলিলরূপে সাদরে গৃহীত ও রক্ষিত হইবে।

পুস্তক মুদ্রণ ব্যাপারে শ্রীমান শতদল গোস্বামী, শ্রীমান হিমানীশ গোস্বামী ও শ্রীমান নির্মলকুমার চক্রবর্তী আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ না পাইলে এই গ্রন্থখানি আদৌ লিখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার সমব্যবসায়ী শিক্ষকবৃন্দ (Birds of the same feather) কে বলিতে চাই যে তাঁহারা যেন বৃত্তি নির্বাচনে আমারই মত ভুল করিয়া না বসেন। শিক্ষকতা একটি অতি পবিত্র বৃত্তি তাহা আমি স্বীকার করি এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি শিক্ষকতাকে 'ব্রত' হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম—(এই গ্রন্থখানি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে ডাক বিভাগে প্রারম্ভিক ২৫০ টাকা বেতন উপেক্ষা করিয়া ৫০ টাকা বেতনের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরিকেই আমি অধিকতর মর্যাদা দান করিয়াছিলাম !) কিন্তু ঐ বৃত্তি দ্বারা একজন শিক্ষকের শুধু ভদ্রভাবে জীবন ধারণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন—তাহারও সংস্থান হয় না। তারপর ধরুন 'সম্মান', তাহাও বর্তমান যুগের শিক্ষকদের ভাগ্যে নাই বলিলেই চলে।

এখন শিক্ষকছাত্র সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহা এ যুগের অভিসম্পাত বলিয়া মনে করি। মনে করি, কিন্তু সময়ের বদল ঘটাইতে পারি না, অন্য কেহ পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। উচ্চমহলের গাল ভরা বক্তৃতায় অবশ্য শুনিতে পাওয়া যায়—শিক্ষক, ছাত্রের শিক্ষা-দীক্ষার জনকস্বরূপ (intellectual father)—"এই শিক্ষকের হস্তেই ন্যস্ত শিক্ষালাভ তাঁহার, যিনি ভবিষ্যৎ-জীবনে হইবেন এই সুবৃহৎ রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার" ইত্যাদি। বক্তৃতাতেই উহার পরিসমাপ্তি। বাস্তব জীবনে ইহার বিপরীতই দেখিতে পাইবেন। আমার সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসরের শিক্ষক জীবনে অনেক দেখিয়াছি এবং অনেক শিখিয়াছি। তাই আমার কথা-গুলি মনে রাখিয়া জীবন সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইবেন—শিক্ষকবৃন্দকে অনুরোধ জানাই। আমার লিখিত—"বর্তমান যুগে শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান" (The cursed life of a school master) রচনাটি পড়িলে বুঝিতে পারিবেন আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সত্য কিনা। আমি ১৯০০ ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৮ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ৩টি স্কুলে চাকরি করিয়াছি, এবং ১৯৫৮, ২৮ অক্টোবর কলিকাতায় ভিসা রিনিউ করিতে আসিয়া ভিসা না পাওয়ায় কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হই। ১৯৫৯ সালে কুপার্স ক্যাম্প (রানাঘাট) জুনিয়র হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ পাই। কিন্তু মাত্র ৭ মাস কাজ করিবার পর, (ক্যাম্প বন্ধ হইয়া যাওয়ায়) কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই।

পূর্বে পূর্বপাকিস্তানে থাকা কালে যে ৩টি স্কুলে কাজ করিয়াছিলাম সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর, (রাজবাড়ী রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন ৪১ বৎসর; সারা মাড়োয়ারী হাই স্কুলে (পাবনা) ৬ বৎসর ও রতনদিয়া (ফরিদপুর) নিজগ্রামে রজনীকান্ত হাই স্কুলে—১১ বৎসর)। এই ৩টি স্কুলের মধ্যে—রাজবাড়ী স্কুলে একদিন ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া আমাকে বলেন—মাস্টার মশায়, এতদিন স্কুলে চাকরি করিলেন—স্কুলের বিলডিংটি পাকা করিয়া যান, যাহাতে আপনার একটা রেকর্ড থাকিয়া যায়, সেই সময় হইতে ঐ কাজে হাত দিই এবং গভর্নমেন্ট হইতে অনেক দরবার করিয়াও কোন গ্রান্ট না পাওয়ায় জনসাধারণের সাহায্যে একটি সুবৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণে সক্ষম হই। (পরবর্তী পৃষ্ঠা-সমূহে দ্রষ্টব্য।)

তাহার পর সারা মাড়োয়ারী হাই স্কুল, রতনদিয়া রজনীকান্ত হাই স্কুল। এই ৩টি স্কুলই ছিল আমার প্রাণ, আমার সাধনার স্থল—আমার কর্মভূমি। একনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিতে পারিয়াছি—ইহাতেই আমার আনন্দ। জন-সেবা বহুমুখী, এই জনসেবার কিছুটা করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি গর্বিত, আমি সুখী।

৪৩/২, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন,
কলিকাতা-৩৬

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য

পরিশিষ্ট

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে অভিমত :

সংশোধন

বই ছাপা হইবার পর কিছু ভুলত্রুটি নজরে পড়িল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংশোধন করা হইল।

পৃঃ		লাইন			
পৃঃ	২৩	১৭	জিতেন্দ্রলাল মিশ্র-র	স্থানে জিতেন্দ্রনাথ মিত্র	হইবে
„	২৭	১৭	থাক করিত	„ প্যাক করিত	„
„	৩২	২২	রবিসুন্দর নাথ	রামসুন্দর নাথ	„
„	৩৩	৯	১৮৯৮	১৮৭৮	„
„	৫১	১৭-১৮	আমি বলিলাম	চাবি	„
„	৩৪	৫	'অম্বিকা ও' কথাটি	বাদ দিতে	„

জন্মস্থানের পরিচয়

আমার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার কালুখালি নামক গ্রামে। স্থানটি পুরাতন কালুখালি স্টেশন হইতে উত্তরে পদ্মানদীর উপরে। আমার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন আমার পিতা রতনদিয়ার হরকুমার রায়ের আহ্বানে রতনদিয়া আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে ঐ গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। আমার জন্ম বৎসর ১৮৭৫।

কালুখালি স্টেশন হইতে এই গ্রামের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। পোড়াদহ হইতে গোয়ালনন্দ রেল পথে জগতি, কুষ্টিয়া কোর্ট, কুষ্টিয়া, (পরে কুষ্টিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত গড়াই নদীর ব্রিজপারে চড়াইখোল নামক একটি স্টেশন হয়।) তাহার পর কুমারখালি, খোকসা, পাংশা, তার পরেই কালুখালি। পরবর্তী স্টেশন বেলগাছি, তার পরেই রাজবাড়ী। পরে রাজবাড়ীর কিছু পূর্বে সূর্যনগর নামক একটি স্টেশন হয় রাজা সূর্যকুমারের স্মৃতিতে। ইঁহার কথা পরে বলিব। রাজবাড়ীর পরবর্তী স্টেশন পাঁচুরিয়া জংশন, ইহার পরেই গোয়ালনন্দ, ইংরেজী উচ্চারণে গোয়ালাণ্ডো। পাঁচুরিয়া হইতেই শাখা লাইন ফরিদপুরে গিয়াছে।

পাংশা ও বেলগাছি ও তন্মধ্যবর্তী কালুখালি, এই তিনটি স্টেশন ১৯১০ পর্যন্ত একটি সরল রেখায় অবস্থিত ছিল। পরে পদ্মানদীর ভাঙনে কালুখালি স্টেশনকে সরাইয়া রতনদিয়ার কাছে আনা হয়। অল্প কিছু দিনের জন্য অল্পস্থায়ী একটি লাইন করা হয় হারোয়ার উপর দিয়া।

কলিকাতা হইতে চাটগাঁ মেলে কালুখালি সাড়ে চারি ঘণ্টার পথ। কুষ্টিয়ার পরেই কালুখালি। মেল ট্রেন মধ্যবর্তী কোনও স্টেশনে থামিত না। কালুখালি জংশন হইবার পূর্বে মেল ট্রেন কুষ্টিয়া ছাড়িয়া সোজা রাজবাড়ীতে গিয়া থামিত। কালুখালি হইতে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত নূতন শাখা লাইন হইবার পর মেল থামিবার মধ্যবর্তী স্টেশন হইল কালুখালি। এই স্টেশন হইতে আমাদের বাড়ী হাঁটা পথে পনের মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত।

নূতন পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত স্থানের এই পরিচয়টুকু দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম।

শিক্ষা প্রসঙ্গেঃ আমার বাল্য

ইং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসর বোয়ালিয়া নিম্ন প্রাইমারী স্কুল হইতে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তুই টাকা মাসিক বৃত্তি পাই। বোয়ালিয়া রতনদিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত চন্দনা নদীর অপর পারে রতনদিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। তৎপর যথাক্রমে উচ্চ প্রাইমারী, ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা পাস করি; কিন্তু নিকটে কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায়, এক বৎসর বাড়ী বসিয়াই ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করি। তৎপর অনেক চেষ্টার ফলে, রাজ-বাড়ী গিয়া রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হই এবং বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া ১৮৯৪ সালে ঐ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। আমার বেশ মনে পড়ে, ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৫,৫০০ ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে ৩৯৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমাদের গ্রামে—কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থাকা দূরে থাকুক, একটি পাঠশালা পর্যন্ত ছিল না। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইনি ছিলেন একজন নর্মাল পরীক্ষায় পাস হেডপণ্ডিত) চেষ্টায় রতনদিয়ায় হরকুমার রায় মহাশয়ের গোলাবাড়ীতে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হয়—কিন্তু স্কুলগৃহখানি ঝড়ে পড়িয়া যাইবার পর, গ্রামের মুরুব্বিদের ঔদাসীন্যের ফলে, উহা আর তোলা হইল না—তাঁহারা সন্তানদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করা অপেক্ষা দলাদলি, মামলা-মোকদ্দমাই অধিক পছন্দ করিতেন। তখনকার দিনে, আমাদের দেশে কুড়ি-পঁচিশখানা গ্রামের মধ্যে একমাত্র উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—এনট্রান্স পাস। ইনিও কিছুদিন রতনদিয়া ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তখন বগুড়ায় মোক্তারী করিতেন।

ক্যাম্পবেল সাহেব ছিলেন বাংলার ছোট লাট—যাঁহার নামানুসারে পরে কলিকাতায় ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল (অধুনা সার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) স্থাপিত হয়। তিনি যখন বগুড়া পরিদর্শনে আসেন, তখন উক্ত মোক্তার মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সরকারী চাকরি দিবার জন্য অনুরোধ জানান। লাট সাহেব অক্ষয়বাবুর হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা পাস জানিয়া তাঁহাকে

'নমিনেশন' দেন। প্রথমে কিছুদিন সব-ডেপুটী, পরে ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট হন। ২৫ বৎসর কাল চাকরী অন্তে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পেনশন ভোগের পর, বারাণসী পুণ্যতীর্থে নিজ গৃহে দেহ রক্ষা করেন।

ঐ সময়ের অনেক পরের একটি হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তখনকার দিনেও শিক্ষা সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই—(The School master was not abroad!)। আমাদের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বিধবা তাঁহার একমাত্র পুত্র (হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক নাক—'ফেতু') সহ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র, উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে সংবাদ রাষ্ট্র হওয়া মাত্র, তাহাকে দেখিবার জন্য ঐ অঞ্চলের বহুলোক উক্ত চাটুর্যে বাড়ীতে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাহা দেখিয়া ফেতুর মাতাঠাকুরানী কাঁদিয়া ফেলেন ও বলেন, 'এত লোকের 'নজর' পড়িলে আমার ফেতু বাঁচবে না।' তা হলেই বুঝুন, ইহারও বহু পূর্বে অক্ষয় বাবুর এনট্রান্‌স পরীক্ষা পাসের সংবাদে কতখানি উত্তেজনার উদ্ভব হইয়াছিল। তখনকার দিনে কেহ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, মোক্তারী করিতে এবং মাইনর (মধ্য-ইংরাজী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ওকালতি করিতে অনুমতি পাইতেন। আমি যখন রাজবাড়ী স্কুলের ছাত্র, তখন অভয়াচরণ মৈত্র (সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বি, এল-এর পিতা) ও আরও কয়েকজন মাইনর পাস ছিলেন নাম করা উকীল। এবং চন্দ্রনাথ লাহিড়ী, গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি ছিলেন 'ছাত্রবৃত্তি' পাস, নামকরা মোক্তার। জানিয়াছি, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও অনেকে মোক্তারী করিতে অনুমতি পাইবেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প জানিয়াছি শিক্ষক জীবনে, সেটি এই—

তখনকার দিনে জেলার জজ সাহেব মোক্তার নির্বাচন করিতেন। জজ সাহেবের হাতে একখানি রুল, পেসকারবাবু সহ আসিয়া বটতলায় অনেকগুলি লোককে বসিয়া থাকিতে দেখেন—প্রত্যেকের হাতে একখানি করিয়া ভাঁজ করা কাগজ (হস্তলিপি, চলিত কথায়—'মশ্‌')। জজ সাহেব পেসকার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত সব লোক কি জন্য আসিয়াছে?" পেস্‌কার জবাব দিলেন—"হুজুর, ইহারা সকলেই মোক্তারী পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে।" "ইহাদের হাতের লেখা দেখিয়াছ?" 'হাঁ হুজুর—ইহাদের সকলেরই হাতের লেখা ভাল।" "ইহারা প্রত্যেকে আট আনা 'ফী' দিয়াছে?" হাঁ হুজুর, দিয়াছে।" তখন জজ সাহেব রুল ঘুরাইয়া

বলিলেন—"সব পাস!'

ইহা নিছক গল্প হইতে পারে—কিন্তু ব্যাপারটা যে ঐ ধরনেরই ছিল—তাহা সত্য। আমার রতনদিয়ার বাড়ীতে প্রাচীন কালের যে সব দলিল পত্র মোকদ্দমার রায়, তায়দাদ ইত্যাদি এখনও রক্ষিত আছে, তাহার মধ্য হইতে একটি মোকদ্দমার রায় পড়িয়া হাসি দমন করিতে পারি নাই। তাহার একস্থানে মুনসেফবাবু—(বাংলায় লিখিয়াছেন, রায় ইত্যাদি বাংলায় লেখা চলিত ছিল)—"যাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল—ইনি একজন ইংরাজ, ইনি যীশু-খৃষ্টকে ভজনা করেন--তেঁই (সেই হেতু) মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না—তাঁহার সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়া আমি এই মোকদ্দমা 'ডিসমিস' করিলাম—মোকদ্দমার খরচা—যার যার নিজের।"

এখন আমার কথায় আসি। আমার যখন ছাত্র-জীবন, তখন মাত্র কুমারখালী হাইস্কুল, ও পরে ফরিদপুর জেলা স্কুল বর্তমান ছিল। ইং ১৮৮৮ সালে রাজবাড়ীতে রাজা সূর্যকুমার ইন্‌ষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। গোয়ালনন্দ মহকুমা যেখানে অবস্থিত ছিল, পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায় গভর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত হাই স্কুলটি রাজবাড়ী উঠিয়া আসে এবং তৎকালীন ডি-পি-আই, সি. এ. মার্টি'ন সাহেবের অনুরোধ ক্রমে লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীর জমিদার রাজা সূর্যকুমার গুহরায় উহার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার লন। ইহার ৫ বৎসর পর (১৮৯৩ সালে) বানিবহের জমিদার বাবুরা এই রাজবাড়ীতে গোয়ালন্দ হাইস্কুল স্থাপন করেন। ইহার পরবর্তী কালে ক্রমে স্থাপিত হয়—কোড়কদি হাই স্কুল, খানখানাপুর হাই স্কুল, নলিয়া এস-এম ইন্‌ষ্টিটিউট, রামদিয়া হাই স্কুল, কামারখালী হাই স্কুল, কসবা-মাঝাইল হাই স্কুল, সমাধিনগর হাই স্কুল, হাবাসপুর হাই স্কুল, রতনদিয়া রজনীকান্ত হাই স্কুল, বেলগাছি হাই স্কুল প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কি চরম দুর্গতিই ছিল। আমার ছাত্র-জীবন হইতেই একটি সংকল্প মনে মনে স্থির হইয়া গিয়াছিল যদি কোনও দিন মানুষ হইতে পারি তাহা হইলে স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিব।

রাজবাড়ী স্কুলে যখন হেডমাস্টারের পদে কাজ করি, তখন সেই সুযোগ উপস্থিত হয়। পাইকপাড়ার জমিদার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ রতনদিয়া ডিহি কাচারী পরিদর্শনে সস্ত্রীক রতনদিয়া উপস্থিত হন। আমরা গ্রামবাসীরা তন্মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা গিরিজাকুমার রায়, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,

বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার বাহাদুরকে অভিনন্দনের মাধ্যমে রতনদিয়াতে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপনের অনুরোধ জ্ঞাপন করি। তিনি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া স্কুলের জন্য কয়েক বিঘা জমি দান পত্র লিখিয়া দেন—(A Regd. Deed of Gift); স্কুলগৃহ নির্মাণ জন্য ২৫ বাঁধ 'করুগেট টিন দান করেন এবং যতদিন স্কুলটি আত্মনির্ভরশীল না হয়, মাসিক ১০ টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। অল্পকাল মধ্যেই স্কুলটি গভর্নমেণ্ট হইতে মাসিক ৪০ টাকা গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড প্রাপ্ত হয় এবং আত্মনির্ভরশীল হয়। তার পর উক্ত মধ্য-ইংরাজী স্কুল ধীরে ধীরে কিরূপে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্নীত হয়, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিতেছি। তখন কে-বি (কালুখালি ভাটিয়াপাড়া) রেলওয়ের গঠন কাজ শেষ হইয়াছে। এন্‌-জিনিয়ার মিঃ কে-বি রায়ের বাংলো ও তৎ সংলগ্ন জমি স্কুলের একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়াতে আমি তৎকালীন ফরিদপুরের জেলা শাসক মিঃ সি. এ. পোরটার (আই সি এস)-কে ধরিয়া উহা স্কুলের জন্য মাত্র ১৫০০ টাকায় খরিদের ব্যবস্থা করি এবং নগেন্দ্রকুমার রায় উক্ত টাকা রতনদিয়ার অন্নদাপ্রসন্ন সান্যালের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এই টাকা লইয়া নগেন্দ্রকুমার ও অন্নদাপ্রসন্নর মধ্যে অসদ্ভাব হয় এবং উহা শেষ পর্যন্ত দেওয়ানী আদালত পর্যন্ত যায়। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিও মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। এবং দেনার টাকা সান্যালকে বুঝিয়া দিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করেন। এই টাকা সংগ্রহ ব্যাপারে কমিটিকে কম বেগ পাইতে হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

(১) অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (ইনি অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।) যতদিন না স্কুল আত্মনির্ভরশীল হয় তিনি প্রতি মাসে ১০ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রাম (তিনি তখন চট্টগ্রামের ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট) হইতে স্কুলের জন্য কিছু আসবাবপত্র আমাকে পাঠাইয়া দেন, তিনি আজ পরলোকে—কিন্তু যত দিন স্কুলটি থাকিবে, অখিলবাবুর নাম, স্কুলের কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন সন্দেহ নাই।

(২) রতনদিয়া হইতে আধমাইল উত্তরে অবস্থিত হারোয়ার জমিদার জনাব ইউসুফ হোসেন চৌধুরী, বি এল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি এই স্কুলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও পরবর্তী কালে বহুদিন সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনায় স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। স্কুলের অনুমোদন লাভের জন্য রিজার্ভ-ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহ কার্যে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। একদিন শ্রীমান মাখনলাল নাথ ও আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বলুন তো কি ভাবে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করা যায়?" তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন এবং ১০০ টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"ভাবনা কি? হইয়া যাইবে।" তারপর জনসাধারণ হইতে 'স্কুল-ডোনেশন' সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন—তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতায় অল্পদিন মধ্যেই উক্ত টাকা সংগ্রহ হয়। আমার আত্মীয় দেবেন্দ্রনাথ রায় এম-এ তখন বেথুন কলেজের প্রফেসর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'—তাঁহার সাহায্যে অল্পদিন মধ্যেই স্কুলটি অনুমোদন লাভ করে।

(৩) শ্রীমান মাখনলাল নাথ নিঃসন্তান—তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম—"ভগবান তো তোমাকে সন্তান দান করেন নাই আইস স্কুল করি, শত শত সন্তানের মুখ দেখিতে পাইবে।" মাখন রাজী হইয়া যান এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতা রজনীকান্ত নাথের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্কুলটির নাম 'রজনীকান্ত হাই স্কুল' করা হয়। উক্ত চৌধুরী সাহেব তৎকালীন রাজবাড়ীর এস-ডি-ও সাহেবকে আনিয়া সভা করিয়া উক্ত নাম প্রবর্তন করেন। মাখনলাল একখানি সুবৃহৎ করুগেট টিনের গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন এবং হাই বেঞ্চ, সিঙ্গল বেঞ্চ, টেবল, চেয়ার, বোর্ড, লাইব্রেরীর জন্য আলমারী ইত্যাদি আনিবার দরুন আনুমানিক চার হাজার টাকা ব্যয় করেন। আমি রাজবাড়ী স্কুল হইতে অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘ দশ বৎসর ঐ স্কুলের সেবা করিয়া ১৯৫৮ সালের মে মাসে কলিকাতা চলিয়া আসি। শ্রীমান মাখনলাল পারিবারিক চক্রান্তে বীতশ্রদ্ধ হইয়া শান্তিলাভের জন্য কলিকাতা চলিয়া আসেন—তিনি বর্তমানে যাদবপুরে বাড়ী খরিদ করিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতেছেন। ঐ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল—মাখনলালের বিদ্যোৎসাহিতা, নিষ্ঠা, অক্লান্ত শ্রম ও উৎসাহ, সর্বোপরি অর্থ সাহায্য।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি হারোয়ার জমিদার ইউসুফ হোসেন চৌধুরীর উৎসাহের কথা। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই রতনদিয়া বাজারের শ্রেষ্ঠ

ধনী, বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী শ্রীমান কৃষ্ণলাল সাহার উৎসাহের কথা। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম হইতে বাজারের মহাজনদিগের নিকট হইতে 'স্কুল-বিত্তি' সংগ্রহ ব্যাপারে ইনিই অগ্রণী হইয়া কাজ আরম্ভ করেন ও মাখনলালের সহিত সহযোগিতা করিয়া স্কুলের আর্থিক সংকট দূর করেন ; তিনি দীর্ঘকাল স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তাঁহার সুনিপুণ ব্যবস্থায় স্কুলে কোন দিন অর্থসংকট দেখা দেয় নাই, প্রায় রোজই একবার করিয়া স্কুলে উপস্থিত হইয়া আমাদের অভাব অভিযোগ শুনিতেন এবং তাহা দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রতনদিয়ার বাহিরেও ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুনাম বর্তমান। ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া মাঝে মাঝে গ্রামের চতুষ্পার্শ্বের মামলা মোকদ্দমার আপোষ মীমাংসা করিয়া দিয়াছি এবং ইঁহার জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি।

আমার ছাত্র জীবন—১৮৮৯

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি আমি এক বৎসর কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হইতে না পারিয়া অবশেষে রাজবাড়ী রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে গিয়া ভর্তি হই। রাজবাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে বেণীনগর গ্রামে আমার দূরবর্তী সম্পর্কীয় মাতুল শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী থাকিয়া স্কুল করিতে হয়। কিছুদিন সে বাড়ীতে থাকিবার পর তাঁহার একমাত্র পুত্র কলেরায় আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। তখন গ্রীষ্মের বন্ধ আরম্ভ হয়—আমি রতনদিয়া চলিয়া আসি। স্কুল খুলিবার একদিন পূর্বে যখন বেণীনগর গেলাম, দেখি আমাকে দেখিয়া সকলেই পুত্রের কথা মনে পড়ায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমারও চোখে জল। ভাবিয়া দেখিলাম —এ আশ্রয়ে আর থাকা চলে না। তবু থাকিতে হইল, তবে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম আমি ঐ বাড়িতে না থাকিলেই বোধহয় তাহাদের বর্তমান শোকাচ্ছন্ন মন শান্তি পায়। তারপর আসিল বর্ষাকাল। দারুণ প্লাবন। স্কুলে যাইবার দুইটি পথ ছিল, একটি চরনারায়ণপুর, গোদার বাজার পথে—এইটিই 'শর্টকাট'। আরটি এক মাইল কাঁচা রাস্তা দিয়া উঠিয়া রেললাইন ধরিয়া। ঐ কাঁচা রাস্তাটি বর্ষাকালে ডুবিয়া যাইত। দুই হাত তিন হাত জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয় (কোন কোনও দিন নৌকা মিলিত)। একদিন ভরা ভাদ্র মাস —গামছা পরনে, বই কাপড় হাতে, রেল লাইনের ব্রিজের সম্মুখীন হইয়াছি,

স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে ব্রিজের অপর দিকে লক্ষ্মীপুর গ্রামে গিয়া উপস্থিত। বহুকাল হইতেই চন্দনা নদীতে সাঁতার দেওয়া অভ্যাস ছিল, তাই রক্ষে! কোথায় বই, কোথায় কাপড় চোপড়! এক কায়স্থ বাড়ী হইতে একখানি কাপড় সংগ্রহ করিয়া ঐদিনই টু-ডাউন ট্রেনে রতনদিয়া গিয়া উপস্থিত। তখনও বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম "পড়াশুনা করা আমার অদৃষ্টে নাই, 'বামুনপণ্ডিতি' করিব।" বাবা বলিলেন, "না, তাহা হইবে না। তুমি রাজবাড়ী হোটেলে থাকিয়া পড়িবে; হোটেল চার্জ চার-পাঁচ টাকা যাহা লাগে, আমি মাস মাস দিব।" গেলাম হোটেলে। বর্তমানে যেখানে গোয়ালন্দ হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে আমাদের সময়ে 'রজনী রায়ের হোটেল' ছিল। ঐ হোটেলের মালিক রজনী রায় মহাশয় ছিলেন অতি ভদ্র ও মিষ্টভাষী, আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার একটি রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল—মেয়েটিরও খুব মায়া দয়া ছিল —আমি স্কুল হইতে ফিরিলে রোজই কিছু না কিছু জল খাবার দিত—হয় পেঁপে না হয় সুজির খাবার। তা ছাড়া কলিকাতা হইতে এক সুন্দর চেহারার বাবু আসিয়া ঐ হোটেলে দশ-পনের দিন থাকিতেন। তিনি কোন বড় জমিদারের ম্যানেজার বা ঐ রকম কিছু হইবেন। তিনি আমার হাতের লেখা দেখিয়া মাঝে মাঝে আমাকে কিছু কাজ দিতেন —৫০ খানা ডেমিতে (আদালতে ব্যবহার্য ডিমাই আকারের কাগজ) মাত্র তিন চার লাইন করিয়া লেখা। আমি তাহা সানন্দে করিতাম, তিনিও সানন্দে আমাকে মাঝে মাঝে খাওয়াইতেন। তবে পাছে আমার পড়ার কোন ক্ষতি হয়, তজ্জন্য রবিবার বা ছুটীর দিন ছাড়া কোন কাজ দিতেন না। তিনি আমার পড়াশুনায় মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া আমাকে কলিকাতা নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি যাই নাই। বলিয়াছিলাম, 'এনট্রানস পাস না করিয়া কোথায়ও যাইব না—পাস করি পরে আশ্রয় দিবেন।"

লক্ষ্মীকোল রাজবাটী আশ্রয় লাভ ও সমস্যার অবসান

ইহার কিছুদিন পর (তখন পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে) পুনরায় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। ঐ সময়ে স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয় (শ্রীপতি কাব্যতীর্থ, বাড়ী—গুপ্তিপাড়া) রাজাকে আমার কথা বলেন, (ছেলেটি স্কুলের ফার্স্ট বয়—কিন্তু পিতৃবিয়োগ হেতু আশ্রয়হীন) রাজা সূর্যকুমার তখনই আমাকে আশ্রয় দিলেন। রাজার দুই শ্যালক—মতিলাল ঘোষদস্তিদার (যাঁহার পুত্র

খ্যাতনামা শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার) এবং হীরালাল ঘোষ-দস্তিদার ও আমি একসঙ্গে আহার করিতাম ও একস্থানে শয়ন করিতাম। একদিন রাজার প্রথমা পত্নী (বড়রাণী ক্ষীরোদবাসিনী) আমার মস্তক মুণ্ডিত দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মাথা মোড়া কেন—কি হইয়াছে?" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম—ঐ সময়টা হইতেছে আমার পিতৃ-বিয়োগের অল্পদিন পর (আমার ৯ বৎসর বয়সের সময়ে মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল)। রাণীমাতা সমস্ত শুনিয়া খুব ব্যথিত হইলেন এবং তখন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাকে পুত্র-স্নেহে পালন করিতে থাকেন। উক্ত রাজার দুই স্ত্রী বর্তমান ছিলেন কাহারও গর্ভে সন্তান হয় নাই। বড়রাণীর পরামর্শেই রাজা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন লক্ষ্মীকোলের সন্নিকট ভবদিয়া গ্রামে কুচবিহারের মোক্তার অভয়াচরণ মজুমদারের কন্যা শরৎসুন্দরীকে। তাঁহার গর্ভেও কোন সন্তান জন্মে না। যাহা হৌক তাঁহার তখন বয়স অল্প (১৮-১৯ হইবে) তিনি আমার সহিত কথা বলিতেন না, লজ্জায়। একদিন রাজা তাহা জানিতে পারিয়া ছোটকে বকেন—"তুমি ত আচ্ছা প্রকৃতির! ও ছেলের মত উহার সঙ্গে কথা বলিতে লজ্জা? ছি!" তখন হইতে তাঁহার মুখ খুলিল—কথা ত নয় একেবারে কথার ঝড়! "বাবা, তুমি ত রাজবাড়ী যাও, আমাকে অমুক জিনিস আনিয়া দিবে?"—ইত্যাদি। বড় তাহাতে রাগ করিতেন, বলিতেন—"ওসব কি? ওর পড়াশুনা নাই যে তোমার ফরমাস খাটিবে?" ছোট রাণী বড়কে খুব ভয় করতেন—চুপ করিয়া যাইতেন।

রাত্রে রাজবাড়ীর চেহারা বদলাইয়া যাইত। বৈঠকখানায় গান, বাজনা, আমোদ প্রমোদ—মদ পর্যন্ত চলিত। রাজা নিজে মদ খাইতেন কোন কোন দিন নামমাত্র—ইয়ার-বন্ধুদিগকে যোগাইতেন প্রচুর। বড়মা একদিন আমাকে বলিলেন—"তুমি নায়েব মশাইকে বল চাকর গিয়া টাকা চাহিলেও যেন না দেন, বলিবে আমার হুকুম;" আমি বলিলাম, "কিন্তু রাজা যদি আমাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেন তখন?" "বটে!—তাহা আমি বুঝিব—তুমি যাও।" আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। রাজা আমাদের ষড়যন্ত্র টের পাইলেন, তবে আমাকে কিছু বলিলেন না, বরং তখন হইতে আমাকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন। তার কিছুদিন পর নরেন্দ্রনাথকে পোষ্যপুত্র লওয়া হইল—তখন রাজবাড়ী হইতে মদ ত উঠিয়া গেলই বাদ্যযন্ত্র সব, পাখোয়াজ, তবলা, বেহালা প্রভৃতি

বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন—বলিলেন, 'এসব থাকিলে ছেলে নষ্ট হইবে—তার লেখা পড়া কিছু হইবে না।'

এই সময়ে রাজবাড়ীতে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ উপলক্ষে রাজ-বাড়ীতে খুব ধুমধাম হয়—যাত্রা, থিয়েটার, বাজী পোড়ান-ইত্যাদিতে বহু অর্থব্যয় হয়। বাহির আঙ্গিনায় বৃহৎ মঞ্চ তৈয়ারী হইতেছে, মঞ্চ বাঁধিতে অন্যসব লোকের সঙ্গে রাজার শ্যালক হীরালালও মঞ্চে গিয়া উঠে এবং হঠাৎ পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারায়। বরিশাল গাভানিবাসী উমাচরণ ঘোষদস্তিদারের কন্যা ক্ষীরোদবাসিনীকে যখন সূর্যকুমার প্রথম বিবাহ করিয়া আনেন, তখন দুইটি শ্যালককেও সঙ্গে আনেন এবং পুত্রাধিক স্নেহে তাহাদিগকে লালন পালন করেন। যাহা হউক, উৎসব নিরানন্দের মধ্যে কোনও রকমে শেষ হইয়া গেল বটে, কিন্তু রাজা এই দারুণ ধাক্কা সহ্য করিতে পারিলেন না—দেশত্যাগী হইয়া কলিকাতাবাসী হইলেন।

আমার কলেজ জীবন

আমি তখন এনট্রানস পাস করিয়া কলিকাতা কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। কিছুদিন মেসে থাকিবার পর একটি প্রাইভেট টিউশন যোগাড় করি নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী এম-এ, বি-এল. এটর্নির (মিঃ ডব্লিউ. সি. বনার্জির ভগ্নীপতির) বাড়ীতে। বিজন নামে তাঁহার এক পুত্রকে পড়াইতাম। রাজা কলিকাতা আসিয়াছেন—আর আমাকে পায় কে? আমি এবাড়ী ত্যাগ করিয়া রাজার বাসা বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আমার ঐ এটর্নিবাড়ী ছাড়িয়া যাইবার দিনের দৃশ্য আজও মনে জাগে—বাড়ীর সব ছেলে মেয়েরাও কাঁদে—আমিও কাঁদি! তাঁহারা আজ কোন জগতে, সে খবরও জানি না।

দত্তকপুত্র নরেন্দ্রনাথ ও রাজার শ্যালক মতিলাল স্কুলে ভর্তি হইল—আমি কলেজে পড়িতে লাগিলাম। পৃথক গৃহ-শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও, আমি নরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া পড়াইতাম। নরেন্দ্র লেখা পড়ায় ছিল খুব ভাল—প্রতি বৎসর মেট্রোপলিটান কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিল। কিন্তু-'নিয়তি কেন বাধ্যতে'—একদিন কলেরা রোগে প্রাণ হারাইল।

এস্থলে আমার কলেজ জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করি। আমি কলিকাতায় রাজার বাসায় থাকিয়া মেট্রো-

পলিটান ইনস্টিটুশন (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) হইতে বি-এ পাস করি। তৎপর জেনারাল এসেমব্লিজ (অধুনা স্কটিস চার্চেস কলেজ) হইতে ইংলিশে এম-এ পরীক্ষা দিবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় আমি ইরিসিপেলাসে আক্রান্ত হই। পরীক্ষার চার দিন কোন রকমে তাকিয়া ঠেস দিয়া উত্তরপত্র লেখা শেষ করি, কিন্তু পঞ্চম দিন আর পরীক্ষা হলে যাইতে পারি নাই। ঐ সময় ডাঃ পি-ডি বোস (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) আমাকে তিরস্কার করিয়া বলেন,—"কেন তুমি পরীক্ষার পূর্বে আমার নিকট আইস নাই?" এই খানেই কলেজ-জীবন শেষ। ইহা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। রাজা সূর্যকুমারের বন্ধু, কে. জে. ব্যাডস আই-সি-এস তখন ডাক বিভাগের কম্পট্রোলার। রাজার অনুরোধে ব্যাডস সাহেব আমাকে অডিট বিভাগে নিয়োগ করেন। (এই চাকরির ইতিহাস পরে বর্ণনা করিব)।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি আমি পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ ক্লাস পর্যন্ত কোথাও বেতন দিয়া পড়ি নাই। যাকে বলে 'ধান-চাল দিয়ে লেখা পড়া শেখা'—তাই। এম-এ ক্লাসেতে বেতন দিতে হয় নাই 'বাইবেল' পরীক্ষায় সেন্ট জন চ্যাপটারটি মুখস্থ করিয়া প্রথম হইয়া বিনা বেতনে কলেজে পড়িবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলাম। জেনারাল এসেমব্লিজ কলেজে প্রিনসিপাল-মরিসন সাহেব (Rev. Mr. Morrison) আমাকে একখানি সুন্দর মোড়কে চামড়া বাঁধাই বাইবেল উপহার দিয়াছিলেন।

এর পর এই দুইটি ধাক্কা খাইয়া রাজা আর বেশীদিন কলিকাতা থাকেন নাই। পুরীধামে গিয়া ৬০,০০০ টাকা ব্যয়ে সমুদ্র তীরে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন এবং পুনরায় দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছু দিন পর দুই রাণী সহ রাজা শ্রীমান সৌরীন্দ্রমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন! এ উৎসব পুরীধামে নিজ বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। রাজা যখন বাড়ী নির্মাণ করেন তখন ঐ বাড়ীর নাম রাখিয়াছিলেন 'নরেন্দ্র কুটীর'—পূর্ববর্তী দত্তকের স্মৃতি রক্ষার জন্য। রাজার মৃত্যুর পর ঐ বাড়ীর নাম দেওয়া হয় 'ভিকটোরিয়া ক্লাব।' রাজা ভুবনেশ্বরেও একখানি বাড়ি ও অনেক ভূসম্পত্তি করেন এবং শেষ পর্যন্ত ভুবনেশ্বরেই দেহ রক্ষা করেন। আমি তাঁহার অসুস্থতার 'তার' পাইয়া যখন ভুবনেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হই, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। রাণীরা মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতেছেন। যে

স্থানে তাঁহাকে দাহ করা হয় ঐ স্থানে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প পূর্ব হইতেই ছিল। রাজার উইল খুলিয়া দেখা গেল আমাকেও এস্টেটের একজিকিউটর করা হইয়াছে। তখন ছুটিয়া আসিলাম রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ীর এস-ডি-ও সাহেবের সাহায্যে প্রাসাদের প্রত্যেক ঘরে তালা লাগাইয়া পাহারা বসাইয়া পুনরায় ভুবনেশ্বরে গিয়া স্বর্গীয় রাজার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করাই। ভুবনেশ্বরে একহাজার ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডাদের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগকে ভোজন ও দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট ও আপ্যায়িত করা হয়। তাহার পরবর্তী কাজ হইল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা।

এই শিবমন্দির নির্মাণ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে আমাকে চার বার পুরী ও ভুবনেশ্বরে আসিতে হয়। টাকা কড়ির ব্যাপার সকলকে বিশ্বাস করাও যায় না। আবার স্কুলের চাকরি ও শিবমন্দির নির্মাণ এই দুইটি দায়িত্ব পূর্ণ কাজও এক সঙ্গে চালান যায় না। তবে 'শিব ঠাকুরের' কৃপায় তাঁহার কাজ তিনিই আমাদের দ্বারা করাইয়া লইলেন। বসিয়া থাকা লোক ছিলেন মৃত রাজার দুই পক্ষের দুই শ্যালক—মতিলাল ঘোষদস্তিদার ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইঁহাদের ও পাণ্ডাদের সহযোগিতায় উক্ত কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।

আমার চাকরি জীবন

আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজা সূর্যকুমারের বন্ধু মিঃ কে. জে. ব্যাড্‌স, আই-সি-এস'এর অনুগ্রহে ডাক বিভাগে চাকরি লাভে সমর্থ হই। উক্ত সাহেব যখন গোয়ালনন্দের (রাজবাড়ীর) এস-ডি-ও ছিলেন, তখন রাজার সহিত উক্ত সাহেবের হৃদ্যতা জন্মে। সাহেব আমাকে কিছু ডিকটেশন দিলেন—আমি খস্‌ খস্‌ করিয়া লিখিয়া গেলাম আমার হাতের লেখা দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তিন মাস এপ্রেনটিস রূপে অডিট বিভাগে নিয়োগ করেন এবং তিন মাস পর ২৫০ টাকা বেতনে অডিটর পদে বহাল করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাকে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—মিঃ স্মিথ সাহেবের সঙ্গে কাজ করিতে হইত। আমি অল্প বয়সে বি-এ পাস করিয়াছি ও বড় সাহেবের অনুগ্রহ ভাজন হইতেছি দেখিয়া কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তাঁহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—"এই বার সাহেব আপনাকে নিজের

পোস্টে বসাইয়া দিয়া বিলাত চলিয়া যাইবেন! ঐ সাহেব কত লোককে দিয়া ঘাস কাটাইয়া লইয়াছে মশাই, পরে শূন্য হস্তে বিদায় দিবেন।" আমি ঐ সব টিটকারী গ্রাহ্য করি নাই। তিন মাস কাজ করিবার পর আমি যখন সাহেবের সহিত দেখা করিলাম, সাহেব আমাকে বলিলেন "দিল্লী অথবা নাগপুরে যাইতে প্রস্তুত আছ?" আমি বলিলাম—"না মহাশয়, আমার কলিকাতাই পছন্দ।" "কিন্তু এখন ত এখানে কোন ভেকানসি নাই।" আমি আরও তিন মাস অপেক্ষা করিলাম। আমি যদি তখনই সাহেবের কথায় রাজী হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে ২৫০ টাকা প্রারম্ভিক বেতনে দিল্লী বা নাগপুর যাইতে পারিতাম। তার পর ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম, দিল্লী নাগপুর ত বাড়ীর কাছে এণ্ডামানে পাঠাইলেও আপত্তি করা উচিত ছিল না, যে হেতু পরে কলিকাতা আসিতে পারিতাম না, এমন নয়। যাহা হউক এই সময় একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় আমাকে রতনদিয়া চলিয়া আসিতে হয়। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়নাথ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন—আমি দেশের বিষয় সম্পত্তি ও অন্যান্য সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়িলাম, ঠিক ঐ সময়ে রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনের সহকারী হেডমাস্টারের পদ খালি হয়—আমি ৫০ টাকা বেতনে ঐ চাকরী গ্রহণ করিলাম—আর কলিকাতার চাকরিতে ফিরিয়া গেলাম না। যে ক'মাস এপ্রেনটিস ছিলাম, ত্রিশ-চল্লিশ টাকা করিয়া মাস মাস এলাউয়েনস পাইতাম—তাহাও পড়িয়া থাকিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় ও মিঃ স্মিথ

এই প্রসঙ্গে দুই জন সহকর্মীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গাঙ্গুলী মহাশয় ছিলেন আমাদের অডিট ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বয়স ৫০ হইবে, অতি অমায়িক লোক, আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া আসি, সে সময় তিনি দেয়ালে টাঙ্গানো উমাচরণ দাস মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তির ফোটোগ্রাফ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ দেখুন উমাচরণ দাসের ফোটো। ধোবার ছেলে কার্যকুশলতায় ঢাকার ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারাল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আপনার উপর যখন সাহেবের সুনজর পড়িয়াছে আপনিও বড় হইবেন—আসিবেন কিন্তু।"—কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহপূর্ণ উপদেশ রক্ষা করিতে পারি নাই—তাই যখনই তাঁহার কথা স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে,

মনটি দুঃখে ভরিয়া যায়।

স্মিথ সাহেব

মিঃ বনহাম কারটার তখন ই. বি. বেল ওয়ের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার কৃপায় বহু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক যুবতী রেলওয়ে ডাক বিভাগে চাকরি পায়। স্মিথ সাহেব তাহাদেরই একজন ছিলেন মনে হয়। কি করিয়া তিনি ডাক বিভাগের ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালাইয়া যাইতেছেন —দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন "$\frac{১}{২}$ কি করিয়া $\frac{১}{৪}$ এর ডবল হয় ইহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না। তুমি ত জান ৪ ২-এর ডবল।" "আমি ত সাহেবের অঙ্কের বিদ্যা দেখিয়া অবাক। আমি সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা বলুনত $\frac{১}{২}$ মানে কি? $\frac{১}{৪}$ মানে কি? $\frac{১}{২}$ বলিলে কোন জিনিষের দুইভাগের অর্ধেক ও $\frac{১}{৪}$ বলিলে চার ভাগের এক ভাগ বুঝায়। যেমন ৮ টাকার অর্ধেক ৪ টাকা ও চার ভাগের দুই ভাগ দুই টাকা—তাহা হইলে ৪ টাকা হল ২ টাকার ডাবল। আচ্ছা—ডেসিমল ফ্র্যাকশন জানেন? $\frac{১}{২}$ কে ডেসিমলে পরিণত করিলে ·৫ হয় ও $\frac{১}{৪}$ ·২৫ হয়। সে হল আর এক বিপদ। সাহেব বলে ২৫ হইল ·৫ এর ৫ গুণ। তারপর বুঝাইয়া দিলাম ·৫ ও যা, ·৫০ ও তা। কাজেই ·৫০ হচ্ছে ·২৫ এর ডাবল—এই ভাবে সাহেবকে অঙ্কে পাকা করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। সাহেব বলে—You see I shall have to argue with my loss about dollar currency—অর্থাৎ ডলারকে কি করিয়া ইণ্ডিয়ান কারেনসিতে 'কনভারট' করিতে হয়—আমি সেদিন সাহেবকে বলিয়াছিলাম—"তুমি সাহেবের সঙ্গে তর্ক করিতে গেলে চাকরি খোয়াইবে। কোন কাজ দিলেই তুমি বড় সাহেবকে বলিবে—I am coming. অমনি ছুটিয়া আমার কাছে আসিবে আমি সব করিয়া দিব।" আমি যে দিন কলকাতা ছাড়িয়া আসি সে দৃশ্য কি করুণ! সাহেবের চোখ ছলছল করিতেছে। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"তোমাকে আসিতেইহইবে—I will miss you badly, nay, painfully Mr. Bhattacharya অর্থাৎ না আসিলে তোমার অভাবে বড়ই বেদনা বোধ করিব।" আজ কোথায় সে গাঙ্গুলী মশাই, কোথায় সে স্মিথ আর কোথায় আমি!

বাদসা সাহেব আমার এইভাবে চলিয়া আসায় খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন

রাজার মুখে শুনিয়াছিলাম। একথা অতি সত্য যে আমি ধরিয়া থাকিলে আমাকে নিশ্চয়ই 'প্রোভাইড' করিতেন। কিন্তু আমার তখন 'রোলিং স্টোন'-এর অবস্থা, পুনরায় এম, এ পরীক্ষা দিতেই হইবে—সংকল্প লইয়া ঐ যে রাজবাড়ী স্কুলের কাজে লাগিয়া গেলাম তখন হইতে রতনদিয়া-রাজবাড়ী—রাজবাড়ী-রতনদিয়া যাতায়াত শুরু হইল। তার পর ১৯০৬তে হেডমাস্টারের পদে উন্নীত হইলাম। পরে অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ও পরবর্তী কালে রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান, হাসপাতালের সেক্রেটারী, রাজবাড়ী জেল ভিজিটর ও রাজার স্টেটের একজিকিউটর ইত্যাদি বহু কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—তখন মাত্র এম-এ ও 'ল' পরীক্ষা দেওয়া শিকেয় তোলা রহিল বহু বন্ধু বান্ধব জুটিলেন—গান, বাজনা, আনন্দের হাট বসিয়া গেল, উপরে উঠিবার সব সংকল্প বন্যার জলে ভাসিয়া গেল।

এস্থলে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি—কারণ, আমি তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। তখন মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি মনে পড়িয়া যায়—কেন ডাক বিভাগের চাকরিতে বীতস্পৃহ হইলাম? চাকরিই যদি করতে হয় তবে যে চাকরিতে সর্বপ্রথমে ঢুকিয়াছিলাম—তাহাই ধরিয়া থাকিলাম না কেন? একবার মনে হয় 'ল' পরীক্ষা দিয়া রাজবাড়ী ওকালতি করিব—দেশের মাটি, দেশের জল—তার চেয়ে বড় কি আছে? আবার মনে হয়, না ওসব মিথ্যা কারবারের মধ্যে কিছুতেই যাব না। ছুটে যাই ফরিদপুর, সেটলমেন্ট বিভাগের অধিকর্তা মিঃ জ্যাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে। তিনি আমাকে কাননগো পদে নিয়োগ করিয়া ১লা জুন কাজে যোগদান করিতে বলেন—আমি রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে ফাইনাল ওয়ার্ড দিব বলিয়া আসি। রাজা অমত প্রকাশ করেন—তজ্জন্য উক্ত চাকরি গ্রহণ করিতে পারি না। (এ প্রসঙ্গে পরে আসিতেছি) ঐ সময় সেটলমেন্ট বিভাগে যাঁহারা কাননগো হইয়া কাজে যোগদান করেন, তাঁহারা সকলেই সেটলমেন্ট কাজ শেষ হইবার পর, সব-ডেপুটি'র কাজ পাইয়াছিলেন এবং আমার এক বন্ধু রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (যশোহর ইতিনা নিবাসী) স্বীয় কার্য কুশলতায় ও ভাগ্যবলে—ডিরেকটর জেনারাল অভ ল্যাণ্ড রেকর্ড'স-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মৌঃ আবদুল করিম (...

ইনস্পেকটর অভ স্কুলস্—ঢাকা বিভাগ) কয়েকবার আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন এবং আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া প্রথমে মাদারিপুর, পরে নারায়ণগঞ্জ স্কুলে অধিকতর বেতনে হেডমাস্টার করিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি যাই নাই। স্কুলের কাজই যদি করি, তবে অন্যত্র যাইব কেন? হক না বেতন বেশী,—যে স্কুল হইতেএনট্রানস' পাস করিয়াছি এবং যাঁহার নুন খাইয়া মানুষ হইয়াছি সেই স্কুলের এবং তাঁহার সেবায় আত্ম নিয়োগ করাই শ্রেয়। তখন সেই প্রবাদ বাক্যের সারাংশ বুঝিতে পারিয়াছি—"এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস্।" এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ বাত্যা যখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল আমিও তখন শিক্ষাদানকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর (১৯৪৭ মার্চ পর্যন্ত) ঐ রাজবাড়ী স্কুলে শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলাম। অন্যত্র অধিক অর্থ বা সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই—আমি 'কনফারমড্ স্কুল মাস্টার' বনিয়া গেলাম।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য—মৌঃ আব্দুল করিম আমার অসুম্মতি সূচক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—I am too glad to find that you are satisfied with your present post and pay, and you are serving the school with whole-hearted devotion, The Rajah will, I hope, soon raise your pay to one hundred rupees or more। রাজা আমাকে ১২৫ টাকা করিয়া লইতে বল্লেন কিন্তু আমি তাহা লই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, (বেশ মনে পড়ে)."হাঁ লইব যে দিন সকল শিক্ষকের বেতন বাড়াইয়া দিতে পারিব।" রাজা আমার কথা শুনিয়া প্রত্যেক শিক্ষকের বেতনের 'স্কেল' (scale) বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

তারপর যখন শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলাম, তখন কি করিয়া স্কুলটিকে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়, সে দিকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিলাম (এ প্রসঙ্গে পরে আসিতেছি।)

আমি যখন লক্ষ্যহীন অবস্থায় দিশাহারা হইয়া নানা কাজের চেষ্টায় ঘুরপাক খাইতেছি এবং সেটলমেণ্ট বিভাগের কাজে যোগদান করা কর্তব্য কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না—তখন আমার পূর্ববর্ণিত সহায় পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক রাজা সূর্যকুমার গুহরায়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত কাজ করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম। আমাদের

উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহা বিবৃত করিতেছি—তাঁহার মূল্যবান উপদেশই আমাকে পথের নির্দেশ দিয়াছিল।

রাজা সূর্যকুমার গুহরায়

গ্রীনবোটে সাক্ষাৎ

স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য রাজা তখন ঢাকা হইতে গ্রীনবোট আনাইয়া বেলগাছির নিম্নে পদ্মা নদীতে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি গিয়া বোটে উঠিলাম। রাজা তখন নৌকায় বসিয়া ছিপ দ্বারা মাছ ধরিতে ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "কি হে, ব্যাপার কি?" ঠিক ঐ সময়ে ভারী ওজনের একটি কাতলা মাছ লাফ দিয়া নৌকাগর্ভে পড়িল। তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"তুমি তো আচ্ছা মৎস্য রাশির মানুষ—আমি এক ঘণ্টা বসিয়া আছি—একটি মাছও 'টোপ' গিলছে না—আর তুমি আসা মাত্র মাছ তোমাকে দেখিতে আসিল!" ইহার খানিক পরেই আসিল সাগরকাঁদির খাসা দই ও বেলগাছির সন্দেশ! (সন্দেশ তখন ৮ টায় সের—দাম আট আনা মাত্র)। ভোজনটা হইল ভালই। তারপর আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, "আসিলাম আপনি কেমন আছেন দেখিতে এবং একটি পরামর্শ গ্রহণ করিতে।" "বিষয়টা কি?" "ফরিদপুরের সেটলমেণ্ট অফিসার—জ্যাক সাহেব (আই-সি-এস) গ্রাজুয়েটদের মধ্য হইতে 'কাননগো' নিয়োগ করিতেছেন,—এখন যাহারা ঢুকিবে, সেটলমেণ্ট কাজ শেষ হইলে তাহারা সব-ডেপুটির কাজ পাইবে। আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছি, তিনি আমাকে ১লা জুন জয়েন করিতে বলায় আমি আপনার কথা বলিয়াছি—'তাঁহার পরামর্শ ছাড়া আমার কিছু করিবার নাই'—তাছাড়া স্কুলের নিয়মানুসারে আমাকে পূর্ণ এক মাসের নোটিস দিয়া আসিতে হইবে। তিনি সব শুনিয়া আমাকে ৭ দিনের সময় দিয়াছেন। এখন বলুন কি করিব?" তিনি উত্তর করিলেন—"বেশত, স্কুল ঘরে তালা লাগাইয়া চলিয়া যাও। আমি স্কুল করিয়াছিলাম যখন রাজবাড়ীর চতুর্দিকে ২০ মাইলের মধ্যে কোনো স্কুল ছিল না একমাত্র ফরিদপুর জেলা স্কুল ছাড়া, রাজবাড়ীতে মাত্র ঈশ্বর পণ্ডিতের একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল—তাহাও ভালরূপ চলিত না। আমি স্কুল করিবার ৫ বৎসর পর বানীবহের বাবুরা স্কুল করিলেন ('গোয়ালন্দ হাইস্কুল')। তখন আর আমার স্কুল রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? একমাত্র তোমার জন্যেই স্কুল

রাখিয়াছিলাম! তুমি ডাক ঘরে চাকরি পেলে—তাতে তোমার মন বসিল না, আসিলে রাজবাড়ী স্কুলে—২৫০ টাকা ছাড়িয়া ৫০ টাকায়! এখন চাও 'মেঠো আমিনী' করিতে। জ্যাক সাহেবের বাচ্চা—জল কাদা ভাঙিয়া ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বুট পায়ে ছুটিবে মাঠে মাঠে তোমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে—পারিবে তাল সামলাইতে?" এ কথা শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির! আমি বলিলাম "আমি তো আপনার কাছে আসিয়াছি আপনার উপদেশ লইতে—আমি চলিয়া গিয়াছি নাকি?" তারপর নৌকায় বিশ্রাম ও ঘুম। বিকালে যখন রতনদিয়া যাইতেছি রাজা কহিলেন "কি ঠিক করিলে বাবাজি—মেঠো আমিনী—না স্কুলে থাকা?" আমি বলিলাম—"কোথাও যাইব না।" "রাগ হইল নাকি?" "রাগ হইবে কেন—আপনি তো ভাল উপদেশই দিয়াছেন—কোনও দিন আপনার অবাধ্য হইয়াছি?" তখন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল হাসি "আরে বস—এত তাড়া কিসের?"

আমি সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর স্কুলে কাজ করিয়াছি। রাজা সূর্যকুমার ইনসটিট্যুশনে ৪২ বৎসর; সারা মাড়োয়ারী স্কুলে ৫ বৎসর ৬ মাস; রতনদিয়া রজনীকান্ত হাইস্কুলে ১০ বৎসর এবং পশ্চিম বাংলায় আসিবার পর রানাঘাট 'কুপার্স'ক্যাম্প স্কুলে ৬ মাস। রতনদিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুলটি কিভাবে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন—রাজবাড়ী

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর আমি এই স্কুলের সহকারী হেড মাস্টারের পদ গ্রহণ করি। হেড মাস্টার ছিলেন—আমারই পিসতুত ভ্রাতার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ। ইনি ১৯০৬ তে ঐ স্কুল ত্যাগ করিয়া যান, আমি তখন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হই। যোগেন্দ্র বয়সে আমার সামান্য কিছু বড় ছিলেন। ঐ ৬ বৎসর আমরা দুজনে একত্রে থাকিয়া খুব আনন্দে দিন কাটাইয়াছি ও স্কুলের সেরা করিয়াছি—যদিও কিছু দিন কাজ করিবার পরই আমি শিক্ষকতায় বীতস্পৃহ হইয়া পড়ি এবং কোনও লক্ষ্য স্থির করিতে পারি না। ঐ ১৯০৬ সনেই আসিল বাজবাড়ী ওয়ার্কশপের কর্মীদের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ছাত্রদের সংঘর্ষ (যাহার জন্য কলিকাতা হইতে ব্যারিস্টার মিঃ বি. এম. চাটার্জিকে আনিতে হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি)। ইহার কিছু কাল পরেই আসিল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। আসিল অনেক ঝামেলা। ছেলেরা বিলাতী লবণ

জলে ঢালিয়া দিতে লাগিল। মেয়েরা স্কুলে পিকেটিং করিয়া স্কুল পরিচালনা প্রায় অচল করিয়া দিল। নানা বিভ্রাটে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। ১৯১১ সনে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে—সম্রাট পঞ্চম জর্জ আসিলেন ভারত পরিদর্শনে। দিল্লীতে বসিল 'করোনেশন দরবার'—সম্রাট 'বঙ্গ-ভঙ্গ' 'নাকচ' করিয়া দিলেন—'ভাঙ্গা' বাংলা আবার 'জোড়া' লাগিল। আনন্দের সীমা নাই, প্রতি জেলায় ও মহকুমায় উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। শোভাযাত্রা, সভা, যাত্রা গান, থিয়েটার, কীর্তন, কবি, ভাসান ইত্যাদি কিছুই বাকী থাকিল না—লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত খরচ হইয়া গেল। ঐ ১৯১১তে আমি গভর্নমেণ্ট হইতে একখানি 'সার্টিফিকেট অব অনার' (Certificate of Honour) প্রাপ্ত হই—"For good work as Head Master and Honorary Magistrate." সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন কলিকাতা আসিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা সদলবলে সেলুনে কলিকাতা গিয়াছিলাম। আমাদের 'সংঘের' সর্বাধিনায়ক কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সুপারভাইজিং স্টেশন মাস্টারের সৌজন্যে। (সংঘের ইতিহাস পরে বর্ণনা করিব)। আমরা নির্বাচিত কয়েক বন্ধু, এক ঝুড়ি কমলালেবু ও মিষ্টান্ন সহ সেলুনে চাপিয়াছিলাম ও সারা রাত্রি হৈ-হল্লা করিয়া কাটাইয়াছিলাম—পর দিবস প্রাতে গড়ের মাঠে সম্রাট দর্শন।

এই প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে পড়িয়া গেল। আমি তখন অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমার লোকাল এনকোয়ারীতে যাইতেছি—পালকিতে (পার্টির খরচে)। আমার বন্ধু যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য বলিলেন—"অন্নপ্রাসনের পর এই বুঝি তুমি প্রথম পালকিতে উঠিলে?" আমি বলিয়াছিলাম—"না, অন্নপ্রাসনে পালকিতে চড়া আমাদের পরিবারে নিষেধ আছে। অন্নপ্রাসনের সময় কে পালকিতে চড়িয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল সে পালকির মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া যায় শুনিয়াছি। তবে অন্য উপলক্ষে পালকি চড়িব না কেন? বিবাহের সময় পালকি চড়িয়া বেলগাছি ধাওয়াপাড়া স্টীমার ঘাট পর্যন্ত গিয়াছি। স্টীমার হইতে নামিয়া পাবনা টাউন শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত গিয়াছি—আর একবার ১১ মাইল পদ্মাচর পাড়ি দিয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি—তাকি সব ভুলে গেলে? এই সেদিনও তো সেলুনে চাপিয়াছিলাম, তুমি মনে কর কি!"

এ স্থলে বলা আবশ্যক—১৯০০এর ২রা ডিসেম্বর হইতে ১৯১৯এর ৬ই

জানুয়ারী পর্যন্ত (১৮বৎসর) রাজবাড়ী স্কুলে কাজ করিবার পর আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ১৯১৮ ডিসেম্বর মাসে, মিঃ জি. ডি. বিরলার প্রাইভেট সেক্রেটরী মিঃ ডি. পি. খৈতান এম-এ, বি-এল সারায় (সারাঘাট দামুকদিয়া নামে প্রসিদ্ধ, জেলা পাবনা) একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে সংকল্প গ্রহণ করেন—স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও আর কয়েকজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অনুরোধক্রমে। ঐ সময়ে স্কুলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (পাকশির সব-এনজিনিয়ার) আমাকে উক্ত স্কুলের ভার গ্রহণের অনুরোধ জানান। পদ্মার ধারে, সুরম্য গৃহে থাকিতে পারিব এবং তাহাতে আমার যথেষ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে মনে করিয়া রাজবাড়ী স্কুল হইতে এক বৎসর বিনা বেতনে ছুটি লইয়া উক্ত স্কুলে যোগদান করি। এক বৎসর মধ্যেই স্কুলটি দাঁড়াইয়া যায়। তখন কর্তৃপক্ষ আমাকে ছাড়িতে চাহেন না—পাঁচ বৎসর ছয় মাস ঐ স্কুলে কাজ করি এবং ১৯২৪ জুলাই মাসে, রাজবাড়ীর তৎকালীন এস-ডি-ও, মিঃ এস. কে. ঘোষ, আই-সি-এস সাহেবের পত্র পাইয়া রাজবাড়ী স্কুলে ফিরিয়া আসি। ঘোষসাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন—"I have enquired all about the Subdivision and find you are the only man, who can restore the school to its former state of glory." তাঁহার ডাকে সাড়া না দিয়া পারি নাই।

আর. এস. কে. ইনস্‌টিটিউশন স্কুল বিল্ডিং

রাজবাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, জুলাই-১৯২৪।

আমার মনে হইল গীতায় ভগবানের বাণীর মত স্কুল যেন আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে—'তুই সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই সেবা কর—আমি তোকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব।' ইহা আমার নিকট দৈববাণী বলিয়া মনে হইল। আমি স্বর্গীয় রাজার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার কাজে আত্ম নিয়োগ করিলাম। সারা মাড়োয়ারী স্কুলের কার্যভার গ্রহণের সময়ই গোয়ালন্দের 'অনরারী ম্যাজিস্ট্রেটের' কাজ 'রিজাইন' দিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবার পর এস-ডি-ও (মিঃ এস. কে. ঘোষ আই-সি-এস) আমাকে উহা পুনরায় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি বিনয় সহকারে ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলাম, আর যে সব 'অনরারী' চাকরি ছিল—(হাসপাতালের সেক্রেটারী, মিউনিঃ

কমিশনার, জেল ভিজিটর ইত্যাদি) কোনটি পুনরায় গ্রহণ করিলাম না। স্কুলের চাকরির সঙ্গে, লক্ষ্মীকোল স্টেটের 'এক্জিকিউটরের' কাজটি রহিয়া গেল। উহা হইতে কি ভাবে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে—"জগন্নাথ বেশে মতিলাল ঘোষ দস্তিদার" দ্রষ্টব্য।

অনন্যমনা হইয়া বিল্ডিংএর কাজে হাত দিলাম বটে, কিন্তু প্রথম কিছু দিন উৎসাহে ভাটা পড়িল। গভর্নমেণ্ট হইতে 'বিল্ডিং গ্র্যাণ্ট'এর জন্য অনেক দরবার করিলাম। কাগজ পত্র বরিশাল ডিঃ এনজিনিয়ার অপিসে চাপা পড়িয়া থাকিল। (বোধ হয় সেগুলির গতি ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে শেষ পর্যন্ত হইয়াছিল)। রাজা বিল্ডিং-এর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মাত্র ৫,০৫৪ টাকার কাজ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে প্লিনথের সামান্য কিছু উঠিয়াছিল। এই স্থলে একটি হাসির কথা মনে পড়ে। ভিত্তি স্থাপন কালে গর্তমধ্যে সোনা, রূপা ইত্যাদি দিবার নিয়ম আছে। রাজধানী হইতে সোনা আনা হইয়াছিল—কিন্তু রূপা আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল,—আমার পকেটে তখনকার কালের একটি দুয়ানি ছিল আমি তাহা গর্তমধ্যে ফেলিয়া দিলাম। রাজা হাসিয়া বলিলেন—"বেশ হ'ল এই স্কুল বিল্ডিং-এর দুই আনা স্বত্ব হইল তোমার।" আমি বলিলাম "এ হাতি পোষা রাজ-রাজড়াদেরই খাটে—গরীব স্কুল মাস্টারের কাজ নয়।" যখন দেখিলাম গভর্নমেণ্ট হইতে কিছু পাওয়া দুরাশা মাত্র, তখন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থী হইলাম। শুধু তাই নয়, রাত্রে বসিয়া বসিয়া রাজা মহারাজা ধনী মহাজনদের নিকট আবেদন পাঠাইলাম পত্র যোগে। কিন্তু বড়দের কাছ হইতে কোন সাড়া পাইলাম না বটে, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা, রাজবাড়ীর উকীল, মোক্তার, জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া রেলওয়ে কর্মীদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতে লাগিলাম। এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে ট্রলিতে গোয়ালন্দ ঘাট, খানখানাপুর, পাঁচুরিয়া যাইয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করা গেল। এমন সময় সম্পূরণ সিং নামে এক (কচ্ছ নিবাসী) ভদ্রলোক পি-ডবলিই-আই হইয়া রাজবাড়ী আসিলেন এবং আমাদের স্কুলে ছেলে ভর্তি করিয়া দিলেন। সাহেব একদিন বলিলেন "দেখুন হেড্-মাস্টার, আমাদের দেশের কোন প্রাইমারী স্কুলের বিল্ডিংও আপনাদের স্কুলের বিল্ডিং-এর চাইতে ভাল।" আমি বলিলাম "বেশত, আপনার ছেলে এই স্কুলে পড়িতেছে, আপনি দয়া করিয়া আমাদের বিল্ডিং করিয়া দেন

না কেন?" তিনি বলিলেন—"হাঁ দিতে পারি, তবে আপনি আমার উপরওয়ালা এস-ডি-ও (রেলওয়ে) সাহেবকে বলুন।" তিনি মাদ্রাজী, তিনি অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হইলেন না যদিও, তবে পি-ডবলু-আই এর কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না—নীরব দর্শকের মত থাকিবেন-এইভাবে কথা বলিলেন। ব্যস্ এই যথেষ্ট। সাহেব তখন কাজে লাগিয়া গেলেন। আমি তাঁর হাতে চাঁদার টাকা, ডোনেশন তুলিয়া দিতে লাগিলাম, (চাঁদা, 'ডোনেশন' হইতে সংগৃহীত ৫০০০ মত টাকা দিয়াছিলাম।) তিনি ভার লইলেন 'লেবার' ও 'ম্যাটিরিয়েলের'। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ছয় মাসের মধ্যে বিল্ডিং-এর কাজ শেষ হইয়া গেল। এ স্থানে উল্লেখযোগ্য, আমরা শিক্ষকেরাও দুই বৎসর ধরিয়া টাকায় একআনা হিসাবে (প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ন্যায়) বেতন হইতে দিয়া কয়েক শত টাকা স্কুল-বিল্ডিং ফণ্ডে দিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে একখানি বৃহৎ শ্বেত-পাথরের 'ট্যাবলেট' আনাইয়া সমস্ত দাতাদের নাম উক্ত ট্যাবলেটে রক্ষা করা হয়—এবং ঐ মাদ্রাজী এস-ডি-ও সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া বিপুল জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে উক্ত বিল্ডিং-এর 'দ্বারোদ্ঘাটন' করা হয়। তৎকালীন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরেরা ও আমার সহকর্মী শিক্ষকেরা যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

আমি যখন এই বিল্ডিং এর কাজে হাত দিলাম, ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্মীকোল স্টেট একটি বড় রকমের মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়ে। পদ্মার চর লইয়া তেঁওতার জমিদারদের সঙ্গে মামলার জন্য স্টেট হইতে টাকা দিয়া বিল্ডিং শেষ করা সম্ভবপর হয় নাই—একবার দৌড়াই তেঁওতার জমিদারদের কলিকাতার বাড়ী তাঁদের আমন্ত্রণে, আবার আসিয়া স্কুলের কাজে লাগি। সেকেণ্ড ইন্স্পেকটর মিঃ পি. কে. বসু কয়েকবার আসেন স্কুল পরিদর্শনে। দুই তিন খানি করিয়া ইঁট বসাইয়া প্লিনথের কাজ শেষ করি। ইন্স্পেকটর বলেন—'আমি আসিব জানিতে পারিলেই হেডমাস্টার মশাই দুইখানি করিয়া ইঁট বসান।' আমি বলি—"Rome was not built in a day, আপনি লিখিয়া পড়িয়া গভর্নমেণ্ট হইতে তো 'বিল্ডিং গ্রাণ্ট' আনাইয়া দিতে পারেন—হাজার কয়েক টাকা দিন না আনাইয়া?" ইনি ছিলেন নড়াইল জমিদার ঘরের দৌহিত্র সন্তান। বলিতাম—"জানেন তো

সার, পুরাতন জমিদার শ্রেণীর অবস্থা—আপনিও তো জমিদার, যিনি গৃহের পত্তন দিয়া গেলেন—তিনি থাকিলে তিনিই এ কাজ শেষ করিতেন।" ইনি রাজবাড়ী আসিলে আমার রাজবাড়ীর বাড়ীতেই থাকিতেন—আমাকে 'তুমি'ই সম্বোধন করিতেন—এ স্কুলটির প্রতি সতিাই তাঁর দরদ ছিল। প্রতিবারই খুব ভাল রিমার্ক লিখিতেন "ভিজিটরস্' বুকে।"

সারা মাড়োয়ারী হাই স্কুল (পাবনা)

জানুয়ারী ১৯১৯—জুলাই ১৯২৪

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এই স্কুলটি মিঃ ডি. পি. খৈতানের পৃষ্ঠপোষকতায়, শ্রীহরিপ্রসাদ আগরওয়ালার অর্থে ও পাকসি এনজিনিয়ার অফিসের এস-ডি-ও, জিতেন্দ্রলাল মিশ্র ও সব এনজিনিয়র যাগীন্দ্র-নাথ দাসের উদ্যম ও সহযোগিতায় স্থাপিত হয়। শুনিয়াছি হরিপ্রসাদ বাবু দুই তিন বৎসর পাটের ব্যবসায়ে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ করেন তাই তাঁহার স্ত্রী বলিয়াছিলেন—একটি ইংরাজী স্কুল করিতেই হইবে যত টাকাই লাগুক। তখন রাম ডাক্তার (ডাঃ রামচন্দ্র মুখার্জি, ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে বাড়ী) হরিপ্রসাদ বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমার রাজবাড়ী বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হন। এই রামবাবু লোকটি ছিলেন—স্কুলের প্রাণ-স্বরূপ (ইঁহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব)। এখানে শুধু বলিতে চাই যে ঐ স্কুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন তিনি এবং তিনিই নাকি হরি-প্রসাদ বাবুকে সারায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করেন ও ১০ হইতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ইনি একজন অদ্ভুত-কর্মা পুরুষ। শুনিয়াছিলাম পদ্মার কূলে সারা পাকসি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমারও তখন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে—যাইতে রাজী হইয়া গেলাম এবং রাজবাড়ী স্কুল হইতে এক বৎসরের জন্য বিনা বেতনে বিদায় লইয়া (রাজবাড়ী স্কুলে এক জন এম-এ, বি-এল হেড মাস্টার বসাইয়া দিয়া) ১৯১৯ সালের ৬ই জানুয়ারী সারা গিয়া ৭ই জানুয়ারী উক্ত স্কুলে যোগদান করিলাম। কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার কান্না আসিল। শুধুই ভাবি, পদ্মার ধারে গাইড ব্যাঙ্কে বসিয়া "হা ঠাকুর, এ আবার কোন্ পরীক্ষায় ফেলিলে ?—৪৫০ ছাত্রের স্কুল ফেলিয়া আসিয়া মাত্র ৩৬টি ছেলের কোচিং ক্লাসের মাস্টার হইলাম!" অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিলাম—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

সম্বন্ধে হরিপ্রসাদ বাবু ও রাম বাবু-শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোনও ধারণাই নাই। হরিপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে ছিল—একটি সেভেন ও এইট ক্লাস বিশিষ্ট কোচিং স্কুল, ২৪ এবং ১২=৩৬ টি ছেলে লইয়া গঠিত এক জন গ্র্যাজুয়েট, একজন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ও এক জন ম্যাট্রিকুলেট স্কুল পরিচালনা করিতে-ছিলেন এবং ঐ সারাতে বহু দিনের একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় বর্তমান ছিল—গভর্নমেণ্ট সাহায্য কৃত-স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন মোঃ এরসাদালি খোন্দকার, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (রাজসাহী বিভাগের পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—তখন সেই অপিস সারা-তে ছিল), এবং পাবনার জেলাম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. এম. দাস এম-এ—স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট, ইনি রাজবাড়ীর এস-ডি-ও ছিলেন, ডি-এম হয়ে পাবনায় আসেন। ইনিই নাকি সব-ইনজিনিয়ার যোগীন্দ্র বাবুকে বলিয়াছিলেন—"যদি হাইস্কুল করিতে চান, ত্রৈলোক্য বাবুকে কিছুদিনের জন্য আনুন।" আমি এরসাদালি সাহেব (সেক্রেটারী) ও মিঃ গুপ্ত (ভাইস প্রেসিডেণ্ট) কে অনেক অনুনয় করিয়া দেখিলাম—ইঁহারা দুইজনেই ক্ষমতাপ্রিয়—অতবড় পদ ছাড়িতে কেহই রাজী নন। তখন ছুটিয়া গেলাম পাবনা এবং মিঃ আর. এম. দাস (ডি-এম) কে বলিলাম "আপনি যখন ঐ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট এবং ডি-এম, আপনি সেক্রেটরীকে 'তার' পাঠাইয়া দিন প্রস্তাবিত হাইস্কুলের সঙ্গে এম-ই স্কুল 'এমালগ্যামেট' করিয়া দিতে।" তিনি একটু হাসিলেন এবং 'তার' পাঠাইয়া দিলেন এবং 'ওয়ান ফাইন মর্নিং' দেখা গেল দুই স্কুল একত্র হওয়ায় একেবারে দড়শ ছেলে! ঐ স্কুলটি ছিল একটি নামকরা এম. ই. স্কুল। পাকাবাড়ী, লাইব্রেরী, ফার্নিচার ও নগদ ১৫০০ টাকা আমরা পাইয়া গেলাম। শর্ত থাকিল—ঐ দেড় হাজার টাকার বহি কিনিয়া স্কুল-লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। তাহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে? মিঃ সেনকে স্কুলের সেক্রেটরী হইতে অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন, "না. না, হরিপ্রসাদ দিবেন টাকা—উঁহারই সেক্রেটারী থাকা উচিত।" ইহার কিছু দিন পরেই ইনি বদলী হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর স্থানে আসিলেন সুকুমার গাঙ্গুলী এম-এ।—এরূপ একজন বন্ধুলাভ খুবই ভাগ্যের কথা—সন্ধ্যা হইবামাত্র আমার বাসায় এসরাজ হাতে আসিতেন আর বলিতেন "যেদিন স্কুলে কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হলে আমাকে ডাকিবেন, আমি গিয়া পড়াইয়া আসিব।"

রাজসাহী ডিভিসনের পোস্ট ও তার বিভাগের অধিকর্তা—এম-এ, পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু পদের বা বিদ্যার অহঙ্কার ছিল না, সকলের সহিতই অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতেন। স্কুলের কেরানী গোবিন্দলাল কুণ্ডু তবলাবাদক ও কীর্তনীয়া—তাঁর সঙ্গেও যে ভাবে মিশিতেন আবার ডি-এম বা সদর এস-ডি-ও (সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের) সঙ্গেও সেই ভাবে মিশিতেন। তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমাদের দিনগুলি খুব আনন্দেই কাটিয়াছে।

সারায় একটি হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া একদিক পোড়াদহ অন্যদিক সান্তাহার ও ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ লাইনের স্টেশনের বাবুরা ছেলে পাঠাইতে লাগিলেন ও আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অল্প দিন মধ্যেই বোর্ডিং হাউসে ৬০-৭০ টি ছেলে জুটিয়া গেল। আর আসিলেন লক্ষ্মীকোলের রাজকুমার সৌরীন্দ্রমোহন, সাগরকাঁদির জমিদার বাড়ী হইতে গজেন্দ্র দত্ত ও রাজবাড়ী হইতে দেবেন্দ্র সিংহ (আমার মাস্টার মশাই স্বর্গত দুর্গানাথ সিংহের পুত্র)। স্কুলে এক বৎসর মধ্যেই সাড়ে তিন শত ছেলে। তার পর বৎসরে-ঐ সংখ্যা চারি শতের উপর গিয়াছিল। হরিপ্রসাদ বাবুর কি আনন্দ! স্কুল আত্মনির্ভরশীল, ঘর হইতে টাকা দিতে হয় না।

স্কুল গৃহ ও বোর্ডিং হাউস ও শিক্ষকদের কোয়ারটার্স : ইহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ যোগীন্দ্র বাবুর (সব ইনজিনিয়ারের) ও ডাঃ রাম বাবুর, আমরা সঙ্গে ছিলাম মাত্র। "হাইয়েস্ট বিডার" হইয়া প্রথমে মাত্র ১৫০০ টাকায় কেনা হইল সেই রেলওয়ে পরিত্যক্ত সারার প্রকাণ্ড স্টেশন বিল্ডিং (যাহার মূল্য তখনকার দিনেও ২৫-৩০ হাজার টাকা হইবে এবং কিনিবার খরিদদারও ছিলনা তা নয়—তবে জনহিতকর কাজ বলিয়া তাঁহারা অনুরুদ্ধ হইয়া ক্রয় করিতে আসেন নাই।) ঐ বিল্ডিং-এ বসিয়া গেল স্কুল। অনেকগুলি রুম, 'অ্যাকোমোডেশন' হইয়া গেল সুন্দর ভাবে। তারপর, মনে পড়ে, তখন পূজার ছুটি পড়িয়াছে। ডাঃ রাম বাবু ভোরে আসিয়া উপস্থিত—আসিয়াই বলিলেন "মাস্টার মহাশয়, চলুন আপনি ত অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী। ৫ টি বিল্ডিং নীলাম হইবে আপনি কিনিবেন। সব ঠিক-ঠাক হইয়া আছে।" "তার মানে?"—"নিয়ম হইতেছে ১৪ দিন আগে পাবলিক নোটিস দিয়া নীলাম করিতে হয়। আমি সেই নোটিসগুলি অফিস হইতে আনাইয়া গত রাত্তিরে লটকাইয়া দিয়াছি—এখন স্কুলই

'হাইয়েস্ট বিডার' হইয়া কিনিবে।" আমি ত শুনিয়া অবাক! গেলাম যেখানে নীলাম হইতেছে। মাত্র ৪৫০০ টাকায় কেনা হইল ৫টি (ইহার মধ্যে ২টি সুবৃহৎ) বিল্ডিং যাহার মূল্য জলের দামে কিনিলেও ৫০ হাজার টাকা। তাহার মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, হেডমাস্টার'স কোয়ারটার্স হইল। অপর গুলিতে হইল 'টীচারস কোয়ারটাস" ও 'বোর্ডিং হাউস।' এখন এ স্কুলটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক হইলেন চার জন, তন্মধ্যে একজন ডবল এম-এ। ইনি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনা ধোবাখোলা স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ইঁহাকে আমিই আগ্রহ করিয়া এই স্কুলে আনিয়াছিলাম এবং ইঁহাকে কুমার সৌরীন্দ্রমোহনের ও মৎপুত্র ধীরেনের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

বোর্ডিং হাউসে ৭০ টি ছেলে। ইহাদের জন্য যত চাউল লাগিবে মাসে মাসে তাঁহার ভার লইলেন আমার প্রতিবেশী ইন্দ্রচাঁদ ওসোয়াল। ইনি ছিলেন জৈন-ধর্মীয়। অতি দানশীল ও চমৎকার লোক। স্কুলের জন্য যখন যাহা করিতে বলিয়াছি, করিয়া দিয়াছেন অথচ স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। ৭০টি ছেলের জন্য বৎসরে কত মন চাউল লাগে—একবার হিসাব করিয়া দেখুন! ইহার ফলে ছেলেদের বোর্ডিং চার্জ লাগিত মাসে মাত্র চার পাঁচ টাকা।

মনে পড়ে—একদিন কথায় কথায় ইন্দ্রচাঁদ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন "আপনি ব্যবসায় করিবেন?—আমি আপনাকে কলিকাতা বৌবাজারে কাপড়ের দোকান করিয়া দিব।" "কত টাকা দিবেন?" "যা লাগে, ধরুন ২০ হাজার ২৫ হাজার।" আমি বলিয়াছিলাম "আমার হাতে অত টাকা দিয়া বিশ্বাস করিবেন?" "আপনি কি বলিতেছেন—আমি 'নাসেরের' হাতে ৪ হাজার প্রায়ই দিয়া থাকি (নাসের তাঁহার পাট খরিদের দালাল), আর আপনি শিক্ষিত, সৎ লোক, বন্ধু লোক।" "না ইন্দ্র বাবু আমি আপনার টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারিব না, শেষে কবে গণেশ উলটাইয়া বসিব।" আমি রাজী হই নাই।

ঐ ৫ বৎসরের উর্ধ্বকাল সারায় থাকা কালে বন্ধু লাভও হইয়াছিল যথেষ্ট। সুকুমার গাঙ্গুলী (সুপার-রাজসাহী ডিভিসনের ডাক বিভাগ); সুকুমার চাটার্জি (পাবনা-সদর এস-ডি-ও); সারা বরফ কলের ম্যানেজার নৃপেন

সেন। পাকসি এনজিনিয়ার অফিসের এস-ডি-ও জিতেন মিত্র ও যোগীন্দ্র বাবু সব-এনজিনিয়ার (এ দুই জনের সহিত বন্ধুত্ব রাজবাড়ী থাকা কালেই ছিল); সারা থানার বড় দারোগা আজিজল হক্ ও ছোট কেশব সেন আরও অনেকের সঙ্গে সন্ধ্যায় থানার বাংলোতে বসিত চায়ের আড্ডা ও গান বাজনার আসর, চলিত রাত্রি ৯টা ১০টা পর্যন্ত। বরফ কলের যদুনাথ রায় ছিলেন নাম করা গাইয়ে। স্কুলের কেরানী গোবিন্দ কুণ্ডু ছিলেন তবলা বাজিয়ে ও কীর্তন গায়ক। কি আনন্দের মধ্য দিয়াই দিনগুলি কাটিয়াছে ঐ পাঁচ বৎসরাধিক কাল। বিকাল হইলেই দারোগা সাহেব আসিতেন ও বলিতেন—"চলুন মাস্টার বাবু গাইড ব্যাঙ্কে মাছ কিনিব।" ক্রমে ক্রমে আসিতেন নৃপেনবাবু, যদুবাবু, ইন্দ্র চাঁদ বাবু প্রভৃতি। পদ্মার গায়ে গাইড ব্যাঙ্ক, নীচে জেলে ডিঙ্গি যাইতেছে, দারোগা হাঁকিলেন 'এই তোর নৌকায় মাছ আছে?' 'হুজুর আছে, ৪টা।' 'কত চাস?' 'হুজুর আট আনা।' 'না—ছ'আনা পাবি।' এই ভাবে ২০-২৫ টা মাছ সংগ্রহ হইল। "মাস্টারবাবু কটা লইবেন?" "দিন দুই চারটি।" অতি ভোরে স্কুলের দপ্তরী বেশ বড় সাইজের দুইটি করিয়া ইলিশ উপহার দিয়া যাইত। ইলিশ ভাতে, ভাজা, সরষে বাটা দিয়া ঝোল, অম্বল যে যত পারো খাও। (ঐ দপ্তরী রাত্রে মেছো-ঘাটায় মাছ থাক করিত ও ৭।৮টি করিয়া মাছ পাইত)। ইন্দ্রচাঁদ বাবু জৈন, তিনি বলিতেন, "আচ্ছা যদুবাবু, আপনারা মছলি খান কেন?" যদুবাবু উত্তর দিলেন—"আপনাদের দুর্ভাগ্য যে মাড়বার দেশের নীচে দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত হয় নাই। হইলে কি হইত বলা যায় না।" ইন্দ্রবাবু চুপ! এতো গেল মাছের কথা। তার পর দুধ ও পাটালি গুড়। দুধ বিক্রী হইত ভাঁড়ে, তিন পয়সা থেকে চার পয়সা সের। আমাদের বাড়ীতে দুধ দিত একটি প্রৌঢ়া মুসলমানের মেয়ে। আমি একদিন বলিয়াছিলাম—"দুধে জল দাও না ত?" সে বলিয়াছিল—"ওমা দুধে জল দিলে যে কুষ্ঠ হইবে।" দুধে জল দিলে কুষ্ঠ রোগ হয়—এ ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য সত্যই দুধে জল দিত না। আর আজ? গঙ্গার জল কমিয়া যাইতেছে, জল কোথায় যাইতেছে সহজেই অনুমেয়।

প্রথমে ইলিশ মাছের ছড়াছড়ি, তারপর ঐরূপ খাঁটি দুধের সঙ্গে খেজুরে পাটালি ও মাঝে মাঝে মর্তমান কলা, ভোজনটি কেমন হইত বলুন।

সারায় যত দিন ছিলাম উহা ছিল আমার পক্ষে 'গোলডেন ডেজ' বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি। স্কুলের কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নির্ভরতা (আমি যাহা করিব তাহাতেই রাজী) লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? একদিন ডক্টর পি. চাটার্জি ডি. এসসি (ইউনিভার্সিটি ইনস্পেকটর) স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া উপস্থিত। স্কুল দেখিয়া খুবই ভাল লিখিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন—"হেড্ মাস্টার, মাড়োয়ারীদের বলিয়া দিন না একলাখ টাকা আমার হাতে দিক, আমি এই পদ্মার চরে কলেজ করিয়া দিই।"

সারার কথা কোনও দিন ভুলিতে পারিব না। সংবাদ লইয়া জানিয়াছি 'গাইড ব্যাঙ্ক' পদ্মাগর্ভে। স্কুল চলিয়া গিয়াছে ঈশ্বরদীতে। খুব ভাল চলিতেছে। পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট হইতে ২৫০ টাকা গ্রাণ্ট-ইন-এইড্ পাইতেছে। রতনদিয়া রজনীকান্ত হাই স্কুল আমার কার্যকাল ১০ বৎসর (১৯৪৮-১৯৫৮) পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর কুপার্স ক্যাম্প।

কুপার্স ক্যাম্প হাই স্কুল (রানাঘাট)

১৯৫৮ সালের মে মাসের ২৫শে, 'বি' শ্রেণীর ভিসা লইয়া পশ্চিম বঙ্গে আসি। কিন্তু আমার ভিসার মেয়াদ চলিয়া যাওয়ায় জুন মাসের ৩ ভিসার জন্য দরখাস্ত করি, ভিসা মঞ্জুর হয় না। ফলে আর রতনদিয়া বাড়ী ও স্কুলে ফিরিয়া যাইতে পারি নাই। তখন রতনদিয়া স্কুলের শিক্ষকতায় 'রিজাইন' দিতে হইল। শিক্ষকতা যত দিন করিয়াছি, গৃহ-শিক্ষকের কাজ কোন দিন করি নাই—ঐ কাজটিতে আমি বরাবরই বীতস্পৃহ ছিলাম। 'একজনের বাড়ী গিয়া পড়ান' কাজটিকে আমি অসম্মানজনক মনে করিয়া আসিয়াছি। এ বিষয়ে আমি একটি রচনা লিখিয়াছিলাম। "বর্তমান যুগের শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান"। উহা যুগান্তরে ১৯৬২তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে কলেজের ছাত্রাবস্থায় করিয়াছি বটে, তাহা কলেজে পড়িবার খরচ সংগ্রহের জন্য দায়ে পড়িয়া। তজ্জন্য কলিকাতা আসিয়া কিছু দিন বসিয়াই কাটাইলাম এবং কোন স্কুলে কাজ পাইবার চেষ্টায় থাকিলাম—কারণ নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকা আমার ধাতে সয় না—যদিও আমার তখন বয়স ৮৮। আমাকে কাজ দিলে তখনও করিয়া যাইতে পারিতাম এ ধারণা আমার ছিল—(তবে অবশ্য লেখা পড়ার কাজ।)

যাহা হউক—কাজের ডাক আসিয়া গেল—রানাঘাট আর, টি. সি কুপার্স ক্যাম্পের হেড্মাস্টারের পদ—বেতন ১৩০৲ ডি, এ—২০৲।

মন্দ কি? 'অফার' সানন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিলাম ও কাজে যোগদান করিলাম। ঐ ক্যাম্পের এডমিনিস্ট্রেটর—মেজর পি. গুহ. মিলিটারী হইতে অবসর প্রাপ্ত—মোটা পেনসনভোগী লোক—চাল চলনে পুরো সাহেব। পূর্বে তাঁহার দেশ ছিল ফরিদপুর জেলায়। আমিও ফরিদপুরের লোক, তজ্জন্য একমাসের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিল। ঐ ক্যাম্পে ছিল একটি জুনিয়র হাইস্কুল ও সাতটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল। রেফিউজী-দের চাপে ঐ তিনি স্কুলটিকে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হন এবং ৭ জন গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ করেন। আমি বহুদর্শী বলিয়া আমা-কেই হেড মাস্টার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন কাজ করিয়াই বুঝিলাম হাইস্কুল করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। রেফিউজীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য (যতদিন তাহাদিগকে দণ্ডকারণ্যে পাঠান না হয়) একটি ব্যবস্থা মাত্র। তিনি যদিও আমাকে বাহিরে খুব শ্রদ্ধা দেখাইতেন ও আমাকে "Grand old man of Faridpur" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—আসলে ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী। ৬ মাস মধ্যেই আমি যতটা সম্ভব স্কুলটিকে গড়িয়া তুলিবার কাজে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি—'ক্লাস নাইন' খোলা হইয়াছে—পর বৎসর 'টেন' খুলিয়া স্কুলটিকে হাই স্কুলের রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছি—এমন সময় 'Over age'-এর জন্য আমাকে (Grand old manকে) আর রাখা যায় না—চিঠি পাইলাম। আমাকে ত 'ওল্ডম্যান' জানিয়াই নিযুক্ত করিয়াছিলেন. চিঠি না দিয়া ডাকিয়া বলিলেই ত হইত—সাহেবকে বলিলাম। সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উক্ত চিঠি উইথড্র করিলেন—আমি রিজাইন দিয়া চলিয়া আসিলাম। আমাকে আরও কিছু দিন কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন (বুঝি-লাম—রেফিউজীদিগকে দণ্ডকারণ্যে না পাঠান পর্যন্ত—কারণ সেখানে গৃহ-সমস্যা লইয়া কর্তৃপক্ষ নাকাল হইতেছেন— ২০।৩০ টির বেশী পরিবার পাঠান সম্ভব হইতেছেনা—) কিন্তুআমার মনে তখন বিতৃষ্ণা—আমি কিছুতেই থাকিলাম না। রেফিউজী ছেলেরা, আমিও পূর্ববঙ্গের লোক বলিয়া যাহারা আমাকে খুব ভালবাসিত এবং এখনও যাহারা দণ্ডকারণ্যে যায় নাই বা গিয়াছে, আমাকে পত্রলিখিয়াশ্রদ্ধা জ্ঞাপনকরে। ঐ ৬ মাস 'রেফিউজী' ছেলে-দিগকে খুব আনন্দ দিতে পারিয়া ছিলাম—রবীন্দ্র জয়ন্তী, ব্রতচারী, থিয়েটার, ফুটবল ইত্যাদির আয়োজন করিয়া,—তাহাতেই আমার আনন্দ—উহাই আমার শেষ জীবনের পাথেয়। ঐ রেফিউজী ছেলেদের সঙ্গে এক শতের

অধিক মেয়ে ঐ স্কুলে পড়িত। আমি চলিয়া আসিবার পূর্বদিন আমাকে যে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়—তাহাকে ছেলে মেয়েদের অশ্রুজল আমাকে খুবই অভিভূত করিয়াছিল, তাহাদের অশ্রুর সঙ্গে আমারও অশ্রু মিলিয়া গিয়াছিল। আরতি ঘোষ নামে একটি অষ্টম শ্রেণীর মেয়ে জল-ভরা চোখে আমাকে দুইটি ফুলদানী উপহার দিয়াছিল—আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোথায়ও ছিট-কাইয়া পড়িয়াছে—হয়তো দণ্ডক্যরণ্যেই নির্বাসিত হইয়াছে—কে জানে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল তাহাকে কিছু উপহার পাঠাইয়া দিব—কিন্তু তাহার ঠিকানা অভাবে উহা ঘটিয়া উঠে নাই।

রতনদিয়া গ্রাম

'রতনদিয়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্তমান। কেহ কেহ বলেন ঐ গ্রামে এক 'চাপে' ৪০-৫০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস থাকায় এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী থাকায় উক্ত গ্রামের নাম রতনদিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারাই গ্রামের রত্নস্বরূপ ছিলেন—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারাই উক্ত নাম দিয়াছিলেন—ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। আমি যতদূর প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিতেছি। উহাই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। যশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার (স্বর্গত) রামরতন রায় (ডাক নাম—'রতনবাবু') ছিলেন অর্থ ও প্রভাবশালী জমিদার। —শোনা যায় তাঁহার জমিদারীকালে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাইত। মহিমসাহী পরগণা—যাহার অন্তর্গত রতনদিয়া গ্রাম, পূর্বে নড়াইলের জমিদারী ভুক্ত ছিল—উক্ত রতন রায়ের নামানুসারে গ্রামের নাম রতনদিয়া হয়। রতনদিয়ার দুটি রায় বাড়ীই ছিল বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। পশ্চিম অংশে নন্দকুমার রায়—পূর্বাংশে বিশ্বনাথ রায়, গোপীমোহন রায়। ইঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন না। ইঁহারা ছিলেন ধার্মিক, ন্যায় পরায়ণ ও গ্রামের 'রত্ন' বিশেষ।—রতন রায় ইঁহাদের জনহিতকর কার্যে প্রীত হইয়া গ্রামটিকে উক্ত আখ্যা দেন। উক্ত পরগণা পরে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের হাতে যায়। তিনি ঐ পরগণায় ৩টি ডিহি কাচারী স্থাপন করেন। বালিয়াকান্দী সব অপিস, সোনারপুর ডিহি কাচারী ও রতনদিয়া ডিহি কাচারী। আমি ছেলেবেলায় রাজমোহন রায় মহাশয়কে ঐ রতনদিয়া কাচারীর নায়েবের পদে দেখিয়াছি।

রতনদিয়া গ্রামের বসতি সন্নিবেশ

এমন একটি সাজান গ্রাম কদাচিৎ দেখা যায়। যেখানে ৫০-৬০ ঘর হিন্দুর বসতি গায়ে গায়ে। ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। গ্রামের উত্তর ভাগে ই. বি. রেলওয়ে লাইন—দক্ষিণ দিক দিয়া চন্দনা নদী প্রবাহিত—পূর্ব দিকে মাঠ—তাহার গায়েই কাশীনাথপুর গ্রাম। রতনদিয়ার নিকটে রেলপথ আসিবার পর বাজার বসিল। তাহার পূর্বে কাশীনাথপুরের সাপ্তাহিক হাটই ছিল একমাত্র বাজার। শ্মশান ঘাটও ঐ খানেই। গ্রামের উত্তরে গঙ্গানন্দপুর। পশ্চিম দিকে মালিয়াট গ্রাম। গ্রামের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া একটি রাস্তা রেল লাইন হইতে চন্দনা নদী পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া একটি রাস্তা গ্রামের মধ্যস্থল হইতে বাজার হইয়া রেল স্টেশনের দিকে গিয়াছে, আর রেল লাইন হইতে এই পথেরই অংশ দক্ষিণেচ ন্দনা নদী পর্যন্ত গিয়াছে। যে রাস্তাটি স্টেশনের দিকে গিয়াছে উহা পূর্বে ছিল, ফরিদপুর ডিস্ট্রিকট বোর্ডের অধীনে—বর্তমানে নব গঠিত ইউনিয়ন কাউনসিলের অধীনে।

বসতি সন্নিবেশ

যে রাস্তাটি গঙ্গানন্দপুর হইতে আসিয়া গ্রামের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া চন্দনা নদী পর্যন্ত গিয়াছে তাহার পশ্চিমাংশে নন্দকুমার রায়ের দোতলা বাড়ী। আমি নন্দকুমার রায় মহাশয়কে দেখি নাই। তাঁহার পোষ্যপুত্র হরকুমার রায়কে দেখিয়াছি। পূর্বাংশে বিশ্বনাথ গোপীনাথ রায়ের বাড়ী। একতলা বাড়ি, পুকুর, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির ইত্যাদি। (বিশ্বনাথ রায়কে দেখি নাই। তাঁহার বংশধর রাজমোহন, শশীমোহন, কৈলাসচন্দ্রকে দেখিয়াছি)। প্রভাব প্রতিপত্তিতে ইঁহারা কেহই কম ছিলেন না। নন্দকুমার রায় ছিলেন বালিয়াকান্দী নীলকুঠির দেওয়ান। ৮ বেহারার পালকিতে বালিয়াকান্দী হইতে রতনদিয়া যাতায়াত করিতেন—মুগ্ধ নয়নে সকলে দেখিত, শুনিয়াছি। পূর্বদিকের রাজমোহন রায় বংশ-পরম্পরায় ছিলেন রতনদিয়া নীলকুঠি পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তির মালিক এবং রতনদিয়া পাইকপাড়া জমিদারের কাচারীর নায়েব। ইঁহারাই গ্রামটিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। যশোহর ও অন্যান্য জেলা হইতে কুলীন সন্তান আনয়ন করিয়া কন্যাদিগকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিয়া নিজভবনের চতুর্দিকে বসাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহাদের কন্যাগণ নিজের স্নেহ-নীড়ে বাস করিতে পারে। নন্দকুমার ও পরবর্তী হরকুমার বসতি দিয়াছিলেন—

মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ; অপরদিকে রাজমোহন রায়েরা বসাইয়াছিলেন—প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন, বনমালী মুখোপাধ্যায়কে (যাঁহার পৌত্র শ্রীমান ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়—এম-এসসি—অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) ও পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গানন্দ, যাদবানন্দ, বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। ইঁহাদিগকে দুই রায় বাড়ীর পূর্ববর্তীরা এমনভাবে তাঁহাদের বাড়ীর গায়ে গায়ে নিজ নিজ জমিতে বসাইয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারাও মনে করিতে পারেন যেন 'কর্তব্যং মহদাশ্রয়ম' আর যাঁহারা বসাইয়াছেন, তাঁহারাও এই নবগুণবিশিষ্ট (নবধাকুললক্ষণং) কুলীন সন্তানদিগকে স্বীয় স্বীয় কার্যে (মামলা মোকদ্দমায়—সাক্ষ্যরূপে কাজে) লাগাইতে পারেন ও তাঁহাদের বিপদে আপদে ইঁহাদের সাহায্য পাইতে পারেন। যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের দুইটি দুর্গ, ঐ নিজ নিজ আবেষ্টনের মধ্যে শত্রু সৈন্যেরা কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। এইস্থলে একটি গল্প বলি—অবশ্য ইহা আমার শোনা কথা, আমি তখন ছোট চন্দনা নদী দিয়া খুব বড় বড় শাল কাঠ ভাসিয়া যাইতেছিল—পূর্বাংশের রায়েরা তাহার কয়েকটি ধরিয়া নিজের হেপাজতে রাখেন—ইহা লইয়া পুলিস হাঙ্গামা হয়—কিন্তু ঐ কুলীন সন্তানেরাই তাঁহাদিগকে বিবাদ হইতে মুক্ত করেন সাক্ষ্য দান করিয়া।

তারপর, ঐ পূর্বাংশের রায়েরা বসাইয়াছিলেন ৩০-৪০ ঘর মাহিষ্যদাস, রজক, বাদ্যকর (যাহারা চূণও প্রস্তুত করিত) ও পশ্চিমাংশের রায়েরা দেবনাথ (যোগী) রবিসুন্দর নাথ (বংশধর রজনীকান্ত, তস্যপুত্রগণ—সনাতন, কাঙ্গিরাম, মুকুন্দ, মাখন) ও আরও ৮।১০ ঘর দেবনাথ (ইহারা সকলেই উপবীতধারী) ; ৮।১০ ঘর সূত্রধর, কয়েকঘর পরামাণিক, ঢুলী পালকি-বাহক ও নমঃশূদ্র। আমরা গোপালচন্দ্র নাথ (চক্রবর্তী) কে ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্কুল সংলগ্ন একটি ইঁদারা খননের জন্য ৩৫০ টাকা পাইয়াছিলাম এবং আমি তখন রাজবাড়ী লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম—ঐ বোর্ড হইতে বাকী টাকা দিয়া একটি ইঁদারা খনন করাই। উহার গায়ে গোপালচন্দ্র নাথ-চক্রবর্তীর নাম খোদাই করা আছে। ইনি নাথবংশের 'পৌরোহিত্য' করিতেন এবং চৈত্রপূজার সময় শ্লোক গাহিয়া

সর্বসাধারণকে যথেষ্ট আনন্দদান করিতেন (ইঁহার গলার স্বর ছিল অতি মিষ্ট)। ইনি স্বর্ণকার বৃত্তিতে বেশ কিছু উপার্জন করিতেন। অপুত্রক ছিলেন—ইঁহার কাছে আমরা যখন যাহা চাহিয়াছি খুব আনন্দের সঙ্গেই দান করিতেন। ইঁহার মৃত্যু হয় ১১০ বৎসর বয়সে। একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের দুই রায় বংশের ইতিহাস বলিতে গেলেই মনে আসিয়া পড়ে হরকুমার রায় মহাশয়ের কথা। ইনি গিরিজাকুমার রায়ের পিতা। আমাদের পূর্ব বাস ছিল বহর কালুখালী, আগে বলা হইয়াছে। পোড়াদহ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালনন্দ পর্যন্ত যখন রেল পথ বিস্তৃত হয় ঐ সময় আমাদের বাড়ীর ঠিক মধ্যদেশ দিয়া রেললাইন যায়। আমার পিতা তখন রতনদিয়া উঠিয়া আসেন। ঐ হরকুমার রায় মহাশয় আমাদিগকে চন্দনা নদীর গায়ে তাহাদের 'গোলা বাড়ী', (পূর্বে নাকি ঐ স্থানে তাঁহাদের ধানের গোলা ছিল)-তে পত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—'শিব স্থাপন করিলাম।' তিনি সর্বদা জপ, তপ, দেবসেবা ও অবসর কালে জমিজমার ব্যাপার লইয়া থাকিতেন—অতি ধার্মিক প্রকৃতির পুরুষ, কোনও দিন তাঁহাকে কেহ কোন মামলার সাক্ষ্যরূপে আদালতে হাজির করাইতে পারেন নাই। নিজের অনেক ক্ষতি হইয়াছে তবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান নাই। হরকুমার রায়ের খ্যাতি গ্রামাঞ্চলে সকলের মুখেই শুনিয়াছি। সংসারী হইয়াও নির্লিপ্ত ছিলেন—মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ হইয়াছিল।

ঐ দুই রায় বংশ ছাড়াও আর দুই ঘর রায় ছিলেন—ইহারা সকলেই আখণ্ডল বংশজ সাণ্ডিল্য গোত্রজ। ইঁহাদেরও বিষয় সম্পত্তি প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। জগবন্ধু রায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আমরা যখন দেখিয়াছি তখন শুনিয়াছি তাঁহার বয়স ১০০ র উপরে। ঐরূপ দীর্ঘ গড়ন স্থূল দেহধারী পুরুষ আজ কাল খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্ররা—প্রসন্ন, দ্বারিক, মাখন, তারিণী রায় মহাশয়দের মধ্যে প্রথম তিন জন পূর্বেই মারা যান। তারিণী (জ্যেষ্ঠ) পুলিস বিভাগে দারোগা ছিলেন, কোনও অপরাধে চাকুরী যায়, গ্রামে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন রতনদিয়া বাজার সবে বসিয়াছে। ইনি কাছারীর কর্মচারীদিগকে ও বালিয়াকান্দীর সুপারকে উক্ত বাজার গঠনে যথেষ্ট সাহায্য দান করেন। অপর রায় বংশের 'পুণ্য শ্লোক' দুর্গাচরণ

রায় মহাশয়কে দেখিয়াছি। ইনি যেদিন কাশীধাম যাত্রা করেন গ্রামের স্ত্রী পুরুষ তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ও পদধূলি লইবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তা ছাড়া ঐ বাড়ীতে দেখিয়াছি, মাধবচন্দ্র রায়, গগনচন্দ্র রায় ও ভগবান রায় (ভগবানের পুত্র অম্বিকা, তাঁহার পুত্রগণ ভবানী, অমূল্য, কানাই, বলাই ও নিতাই।) অম্বিকা ও কৈলাস রায় মহাশয়ের পুত্র মানিকচন্দ্র। ঐ দুইজন, ও রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র বসন্ত রায় ছিলেন আমার সহপাঠী। এই দুই রায় পরিবার ছাড়া গ্রামের ঠিক কেন্দ্র স্থলে প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের উপর ছিল জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ী। ঐ বাড়ী 'ঠাকুর বাড়ী' নামে খ্যাত। ইনি ছিলেন ঐ আখণ্ডল রায় বংশের ও আরও কয়েক পরিবারের গুরুদেব—ইঁহার দুই পুত্র যোগেশ ও ললিত। যোগেশের পুত্র সুরেশ প্রভৃতি কয় ভ্রাতা ও ললিতের পুত্র প্রদ্যোতকুমার। যোগেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীর বিবাহ হয় পাবনা সাতবাড়িয়া নিবাসী বিহারীলাল গোস্বামীর সহিত। ইনি ১৯১৭তে পাবনা হইতে বাস তুলিয়া, রতনদিয়া আসিয়া বাড়ী নির্মাণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল রতনদিয়াতেই বাস করেন। জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন প্রভূত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, সঙ্গীতজ্ঞ অতিথিপরায়ণ ও আনন্দময় পুরুষ। তাঁহার প্রতিপত্তি এত অধিক ছিল যে তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া কেহই পালকি হাঁকাইয়া যাইতে পাইতেন না—পালকি হইতে নামিয়া ঐ পথ খানি হাঁটিয়া যাইতে হইত। তাঁহার বাড়ীর দেউড়ীতে ছিল এক পেটকাটা ঘর, ঠাকুর মহাশয় বসিয়া থাকিতেন এক খানি বৃহৎ গোলাকার টুলে—রাস্তা দিয়া কাউকে যাইতে দেখিলেই হাঁকিতেন "কে যায়?" তাঁহাকে বলিতে হইত 'আজ্ঞে আমি—অমুক।' পরিচয় না দিয়া কাহারও ঐ বাড়ীর পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া যাইবার উপায় ছিল না। এদিকে যেমন ছিল দাপট, অন্য দিকে তিনি ছিলেন বালক-স্বভাব। কঠোরের সহিত কোমলের সম্মিলন এরূপ খুব কম চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ মীমাংসক। শুধু এই গ্রামের কেন—অন্য গ্রামের ঘরোয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, তা জমি জমা সংক্রান্তই হউক বা পারিবারিক সমস্যাই হউক—উহা কোর্ট কাচারীতে যাইতে পারিত না, অতি বিচক্ষণতার সহিত চুল-চেরা বিচার করিয়া দিতেন—সে বিচারে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট থাকিত। আমি দেখিয়াছি রতনদিয়া রাজ কাচারীতে যখন রাজমোহন রায় মহাশয়

নায়েব ছিলেন, ঠাকুরমহাশয়ের জন্য একখানি বড় 'জলচৌকী' পাতা থকিত, ঠাকুর মহাশয় গিয়া তাহাতে বসিতেন এবং যত নালিশ ফরিয়াদ আসিত, তিনি বিচারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন—তজ্জন্য রোজ কিছু কিছু প্রণামীও মিলিত, অনেক সময় দেখিয়াছি বাদী প্রতিবাদী দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়া নজরানা দিত।

নিজে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, জানকী চক্রবর্তী ছিলেন ভাল গায়ক—সন্ধ্যা হইতে ১০-১১টা পর্যন্ত চলিত গানের আসর—নীলমণি সরকারের পুত্র কুঞ্জলাল ছিলেন তবলা বাদক। পরবর্তী কালে একজন ওস্তাদ গায়ক ও সানাইবাদক নদীয়া জেলা হইতে রতনদিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়—নাম আকবর আলি—যেমন সঙ্গীতে, তেমনি রসনচোকী বাজনায় ওস্তাদ। সে আর দেশে ফেরে নাই, রতনদিয়ার আকর্ষণ ছাড়িয়া। রতনদিয়াতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার স্বভাবটি ছিল অতি মধুর, তজ্জন্য সকলেরই প্রিয় হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বাহির হইতে বড় বড় নাম করা গায়ক আসিতেন, তখন আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। সে দিনের কথা মনে হইলে কত স্মৃতি মনে জাগিয়া ওঠে।

রতনদিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ বাসিন্দাদের মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। মাত্র ৬ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল—জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ (বেণী) ও সুধাংশুর পিতা। তারানাথ চক্রবর্তী (অতুল ডাক্তারের পিতামহ); গদাধর ভাদুড়ী (পূর্ণ ভাদুড়ীর পিতা), গোপাল ভাদুড়ী ও অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত সান্যালদের বাড়ী (এই সান্যাল বাড়ীর ইতিহাস পরে বর্ণনা করিতেছি।) পরবর্তী কালে ১৯১৭তে কবি বিহারীলাল গোস্বামী আসিয়া রতনদিয়ায় বসবাস করেন। সত্য কথা বলিতে, রতনদিয়া নাম সার্থক করিয়াছিলেন প্রাচীনেরাই। ক্রমে বংশধরদের নৈতিক পতনের ফলে (মামলা, মোকর্দমা, দলাদলি) ইঁহাদের অধঃপতন ঘটে। তারপর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোন্নতির শুভ লক্ষণ দেখা যায়। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র আনন্দ, দীননাথ, অক্ষয়, এই তিন ভ্রাতার নাম উল্লেখ যোগ্য। এই চট্টোপাধ্যায় গণ ও গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় (মন্মথ, প্রমথ ও শৈলেনের পিতা) কোন্ রায় বংশের আনীত কুলীন সন্তান তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই—তবে তাঁহাদের বাস্তু ভিটা বড় রাস্তার পূর্বাংশে

অবস্থিত থাকায় অনুমান করি তাঁহারাও রাজমোহন শশীমোহনের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা আনীত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, দুই রায় বাড়ীর যখন পতন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় নবযুগের সূত্রপাত হয়। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মথুরানাথ দার্জিলিং চীফ কমিশনার অফিসের হেড ক্লার্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ বাসগৃহের (কাঁচা মেঝে, খড়ের ঘর) চেহারা বদলাইয়া গেল। করিলেন দোতলা পাকা বাড়ী—ধুম-ধামের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা, শ্যামাপূজা, যাত্রাগান কথকতা—ইত্যাদির মধ্যদিয়া যেন গ্রামটি আবার জাগিয়া উঠিল। এ নব জাগরণের সূত্র-পাত হয় ১৮৮৫ সালে—আমি তখন বোয়ালিয়া প্রাইমারী স্কুলে পড়ি। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অখিলকুমার প্রথম গ্রাজুয়েট হন—কিছু কাল সব ডেপুটি পদে থাকিবার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। রতনদিয়ায় ইহাকেই প্রকৃত renaissance যুগ বলা যাইতে পারে। ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর মধ্যে প্রায় ৪০ জন ব্যক্তি গ্রামটিকে দিলেন এক নবরূপ।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে যখন রতনদিয়া এই নবরূপ পরিগ্রহ করে, তখন প্রাচীনদের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রাচীনেরা বাড়ি বিন্যাস অতিসুন্দর রূপেই করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু গ্রামোন্নয়নের অন্য দিকটায় তত মনোযোগ দেন নাই। তবে সেই সময় একটি নবাগত লোকের অবদান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহার নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের জামাতা, নর্মাল ২য় বার্ষিক পাস। ইনি রতনদিয়া (তৎকালীন) ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেড পণ্ডিত বসন্ত রায়ের ভগ্নীপতি—রাজচন্দ্র বায়ের কন্যা 'শশীমুখী'-কে বিবাহ করেন। রতনদিয়া সীমানার উত্তরাংশ হইতে চন্দনা নদী পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে উহা ছিল পাঁচ ছয় ফুট নীচু একটি কাঁচা সড়ক। তখনকার দিনে প্রতি বৎসরই দারুণ বর্ষা হইত এবং বর্ষাকালে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে নৌকার সাহায্য লইতে হইত। ইনি লাগিয়া গেলেন ঐ রাস্তাটির সংস্কার কার্যে। গ্রামস্থ লোকদের নিকট সেরূপ সহানুভূতি পাননা। তবুও দমিলেন না, ফরিদপুর ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডে দরবার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন, গ্রাম হইতেও কিছু সংগ্রহ না হইল তাহা নয়। দিলেন রাস্তা করিয়া, গ্রামের ভিতরে আর

চলাফেরার অসুবিধা থাকিল না, যদিও নিন্দুকেরা বলিতে ক্রুটি করেন নাই—"আরে বিনা স্বার্থে কি কেউ অত খাটে, নিশ্চয়ই উনি মোটা দাঁও মারিয়াছেন!" পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই রায় বাড়ীর তখন দারুণ পাল্লা চলিতেছে—দলাদলি, মামলা মোকর্দমা। পণ্ডিত মশাই কোন দলেই নাই। গ্রামে তখন প্রায় প্রতি বৎসরই কলেরা রোগ দেখা দিত। পণ্ডিত হোমিও ঔষধ হস্তে সকল বাড়ীতে যাইতেন ও রোগীর পরিচর্যা করিতেন। আবার ঐ রোগে কোনো বউ মারা গেলে বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে কান্নায় যোগ দিতেন ও বলিতেন "হায়, হায়—আমার লক্ষ্মী বৌমা চ'লে গেল।" ইহা আমি দেখিয়াছি, তারপর সকলের অগ্রগামী হইয়া শ্মশান পর্য্যন্ত যাইতেন। আমি প্রাইমারী পরীক্ষায় ২ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম, আমাকে কোলে লইয়া কি নৃত্য! যেন যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়াছি। সত্যই ঐরূপ চরিত্রের একটি লোক আজকালকার দিনে বড়ই দুর্লভ।

রতনদিয়ায় নবযুগ আরম্ভ হইবার পর যে সব সন্তান সন্ততি স্ব স্ব প্রতিভা বলে দেশে ও বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী (যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি) বিবৃত করিলাম। ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রত্যেকের বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

আমার রাজবাড়ি স্কুলে শিক্ষকতা কালে

দুইজন ভাবী সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় রতনদিয়া গ্রামে—যাঁহারা রতনদিয়ার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—ইঁহারা দুইজনেই রতনদিয়ার দুই বাড়ীর (ঠাকুর বাড়ীও সান্যাল বাড়ীর) দৌহিত্র সন্তান। তবে উভয়েরই বাল্য হইতে বহু বৎসর রতনদিয়াতেই কাটিয়াছিল বলিয়া এ গৌরব রতনদিয়া সঙ্গত ভাবেই করিতে পারে। ইঁহারা হইতেছেন: শ্রীপরিমল গোস্বামী ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র স্বর্গত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের দৌহিত্র ও বিহারীলাল গোস্বামী (বি, এ) মহাশয়ের পুত্র পরিমল। ইঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সর্বাগ্রে ইঁহার পিতৃদেব বিহারীলালের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

বিহারীলাল গোস্বামী বি-এ

ইনি ছিলেন পাবনা জেলার সাতবাড়িয়া গ্রামের অধিবাসী এবং পাবনা

জেলার অন্তর্গত গোতাজিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বহুদিন ধরিয়া উক্ত স্কুলে সুনাম ও যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া সাতবাড়িয়া হইতে বসবাস তুলিয়া রতনদিয়ায় বাড়ী নির্মাণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রতনদিয়াতে বাস করিয়া গিয়াছেন। ইনি ছিলেন আদর্শবান ও ঋষি প্রতিম পুরুষ। ইঁহার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য—শুধু ইংরাজী বাংলা ভাষায় নহে—সংস্কৃত ও ফার্সি (Persian) ভাষাতেও ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। পূর্বে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, ভারতী, ও বঙ্গভাষা মাসিকে ইনি নিয়মিত লিখিতেন। ইঁহার গীতাবিন্দু নামে গীতার ছন্দানুবাদ বিখ্যাত ছিল। তাহার প্রথম সংস্করণ আমাকে একখানি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে নবগ্রন্থনা হইতে। ইঁহার কুমারসম্ভবের অনুবাদ মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। শেখ সাদির পন্দনামারও কাব্যানুবাদ বাহির হইয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইঁহার উচ্চ আদর্শ, পাণ্ডিত্য ও মধুর চরিত্রের জন্য ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং ইঁহার পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া গভীর শ্রদ্ধা ও মনোবেদনা জানাইয়া শ্রীমান পরিমলকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে প্রায়ই ভাবের আদান প্রদান চলিত পত্রের মাধ্যমে। অবসর গ্রহণের পর ১৯৩১ পর্যন্ত (ঐ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়) রতনদিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তৎকালীন রতনদিয়া গ্রামের 'ছোঁয়াচ' তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—"Being in the world—not of the world।"

শ্রীপরিমল গোস্বামী এম-এ

ইঁহার সম্বন্ধে কিছু জানাইতে হইলে ইঁহার স্বরচিত "স্মৃতিচিত্রণ" "দ্বিতীয় স্মৃতি" ও "আমি যাঁদের দেখেছি" পুস্তকগুলি পড়িলে ইঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ কর্মজীবনের ইতিহাস মিলিবে—উহাতে তাঁহার আত্ম-স্তুতি বা নিজেকে বড় করিয়া দেখানোর কোন প্রচেষ্টার লেশ মাত্র নাই।

ইঁহার বিবাহ হয়, পাংশার অদূরে কালিকাপুর গ্রামের বনেদী প্রাণনাথ বাগচী মহাশয়ের বাড়ী। পাত্রীর পিতা যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সদা হাস্যময়—আত্মভোলা মানুষ। প্রাণনাথ বাগচী ছিলেন আমার পিতার বন্ধু (মিতা—উভয়েরই এক নাম থাকায়।) ঐ সূত্রে বাল্যকালে আমি কয়েকবার আমার পিতার সঙ্গে ঐ বাগচী বাড়ী গিয়াছি। উক্ত বাগচী মহাশয়ের মত গৌরবর্ণ সুপুরুষ আজকাল বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাঁহার পরলোক গমনের পর ঐ বাগচী বাড়ীর সাংসারিক অবস্থার অবনতি ঘটে। শ্রীমান পরিমলের বিবাহ কালে কন্যাপক্ষ হইতে এক পয়সা বরপণ লওয়া হয় নাই। আমি তখন রতনদিয়া বা রাজবাড়ী উপস্থিত ছিলাম না—থাকিলে নিশ্চয়ই ঐ শুভকার্যে যোগদান করিতাম। আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় এই 'পণ প্রথা' মধ্য ও স্বল্পবিত্ত পরিবারকে যেরূপ ধ্বংসের পথে টানিয়া লইতেছে তাহাতে এইরূপ দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়—এইরূপ স্পৃহাশূন্যতা ও ত্যাগ স্বীকার আমাকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল।

পরিমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লহরীলাল—বি-এ ইংরাজী অনার্স। ইনিও সাহিত্যানুরাগী। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মী।

পরিমলের দুই পুত্র—শতদল ও হিমানীশ দুইজনেই পিতৃধারা পাইয়াছেন —ইঁহারা দুই জনেই গল্প লেখক হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। শতদল 'আমাদের গ্রাম' পত্রিকার সম্পাদক। হিমানীশ ইংলণ্ডে পাঁচছয় বৎসর বাস করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার 'লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়' 'বিলিতি বিচিত্রা' ও 'ঘটকালি' গ্রন্থগুলি খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। চাকরিতে নিযুক্ত। গ্রন্থকার ও কারটুনিস্ট হিসাবেও ইনি সুপরিচিত।

পরিমলের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মঞ্জু আচার্য আমাদের গ্রামের একমাত্র বিদুষী রমণী ও আমাদের গর্বস্থল।

মঞ্জু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী এ ও বি গ্রুপের এম-এ। এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর এম-এ। কলিকাতার বি-টি। লণ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অভ এডুকেশন ও মন্টেসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত। বর্তমানে সার গুরুদাস ব্যানার্জি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপিকা, ও যাদবপুরের বি টি কলেজের 'পার্ট-টাইম' অধ্যাপিকা।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি-এ

পূর্বেই বলিয়াছি—ইনি অতি প্রাচীন ও ঐহিত্যপূর্ণ রতনদিয়া সান্যাল বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান। ইনি সান্যাল বাড়ীর গণেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের দৌহিত্র ও যশোহর কাঞ্চনপুর নিবাসী প্রিয়নাথ মৈত্র মহাশয়ের পুত্র। গণেশ সান্যাল মহাশয়ের কন্যা সৌদামিনী দেবী চার পুত্রের জননী। প্রমথনাথ, প্রবোধ, প্রফুল্ল ও রবীন্দ্র। সৌদামিনী (দিদি) ছিলেন যেন মা অন্নপূর্ণা, শুধু নিজের ছেলেমেয়ের নহে, গ্রামের ছেলেমেয়েদিগকে নিজের

সন্তানের মত প্রায়ই খাওয়াইয়া আনন্দ পাইতেন। স্বামী প্রিয়নাথ মৈত্র মহাশয়ও ছিলেন খুব রসিক ও আমোদ প্রিয় ব্যক্তি। আমরা সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিতাম, আমাদিগকে নানা ভাবে মাতাইয়া তুলিতেন। ইনি রংপুর ডি-এম অফিসে হেড ক্লার্ক ছিলেন এবং তাঁহার আয়ও ছিল যথেষ্ট। প্রথম পুত্র প্রমথনাথ মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন আমি তখন এফ-এ পড়ি। প্রায়ই তাঁহার মেসে যাইতাম। তিনি অবশ্য শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তাজহাটের কুমার তাঁহাকে প্রথমে 'গৃহ চিকিৎসক' ভাবে নিযুক্ত করেন—পরে ইনি কুমারের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া ওঠেন ও তাঁহার ম্যানেজারের পদ পান। কুমার বাহাদুর একটি ফুটবল টীম গঠন করেন এবং তাহার উন্নতি কল্পে বাহির হইতে নাম করা প্লেয়ার আনিয়া টীমটি সুগঠিত করেন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া। দ্বিতীয় পুত্র প্রবোধ রংপুরে ওকালতি করিতেন। তৃতীয় প্রফুল্ল ছিলেন সদাপ্রফুল্ল সদাহাস্যময়, রঙ্গ কৌতুকে গ্রামটিকে মাতাইয়া তুলিতেন। এমন বাড়ী ছিল না যেখানে তাঁহার যাতায়াত ছিল না। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম প্রফুল্ল কি করিবে ঠিক করিয়াছ? না, এই ভাবেই জীবনটা কাটাইয়া দিবে? উত্তর দিল, নিজ হাতে ইঁট কাটিব—পাঁজা সাজাইব। কয়েক বৎসর পর শুনিয়াছিলাম—প্রফুল্ল 'কনট্রাকটারি' করেন। সর্ব কনিষ্ঠ রবীন্দ্র ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাঁহার সম্ভাবনাময় জীবনের ইঙ্গিত তাঁহার কৈশোরেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অনেক দিন পর একদিন ডি এম লাইব্রেরীতে দেখা—উস্কো খুস্কো চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, গায়ে একটি পাঞ্জাবী ও উড়নী, বসিয়া আছে চেয়ারে। আমি গেলেই বলিয়া উঠিল—"চিনতে পারেন?" আমি বলিলাম "রবি? তা কি কর এখন?" "একখানা বই-এর দোকান দিয়াছি ক্যানিং স্ট্রীটে।" "ক্যানিং স্ট্রীটে?—ঐ খানে ত অন্য সব জিনিসের দোকান?" রবি বলিলেন, "আজকাল কিছু বিশেষত্ব থাকা ভাল। কলেজ স্ট্রীটে ত বইয়ের দোকান যথেষ্টই আছে।" আমি শুনিয়া অবাক। তার পরবর্তী কালে শুনিলাম 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' বইএর লেখক রবীন্দ্রনাথের নাম সকলের মুখে। দেখিলাম বইখানির অভিনয়। দেখিলাম সত্যই চমৎকার। প্লটের চতুর কৌশল আছে বইখানিতে। ঐ একখানি বইতেই রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়াইয়া পড়ে। যে প্রতিভা এতদিন রবীন্দ্রের অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছিল,

তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া গেল। সর্বজনাদৃত আনন্দবাজার পত্রিকায় ইঁহার পূর্ব হইতেই বিশিষ্ট স্থান ছিল—'দধি কর্দম' ফীচার লেখকরূপে। ইনি দিবাকর শর্মা ছদ্মনামে শনিবারের চিঠিতে লিখিতেন। যে বৎসর (১৯৩২) পরিমল গোস্বামী শনিবারের চিঠির সম্পাদক হইলেন সেই বৎসর হঠাৎ শুনিলাম ইহজগতের মায়া কাটাইয়া রবীন্দ্র শ্রীধামে চলিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি যেমনই আকস্মিক, তেমনই মর্মান্তিক! কি দারুণ সম্ভাবনাই না ছিল রবীন্দ্রের জীবনে! আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে কত 'থার্ড ক্লাস,' 'উদাসীর মাঠ,' 'দিবাকরী,' 'বাস্তবিকা' 'ত্রিলোচন কবিরাজ,' 'মানময়ী গার্লস স্কুল' লিখিতে পারিতেন। যাহা হউক, যখন তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ কলিকাতা পৌঁছিল, আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁহার প্রতিকৃতি সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইল। নাট্যগোষ্ঠী কতস্থানে কতবার যে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' অভিনয় করিলেন ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন আমার রাজবাড়ীর বিশেষ বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার এনজিনিয়ারের কন্যাকে। কোন কোন নাট্যগোষ্ঠী উক্ত বহি অভিনয়ে সংগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ রবীন্দ্রের শোকাচ্ছন্না স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত শনিবারের চিঠি (ফাল্গুন ১৩৩৯) রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যারূপে প্রকাশিত

* রবীন্দ্রের মৃত্যু রংপুরে তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধের বাসায় ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্র গিয়াছিলেন রংপুর বেড়াইতে। শুনিয়াছি, কয়েক ঘণ্টার জ্বরে মারা গেলেন। রবীন্দ্রের জীবন তথ্য আমি লিখিতে অক্ষম, কারণ আমরা উভয়েই অনেকদিন বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছি—দেখা সাক্ষাৎ খুবই কম হইয়াছে। তবে তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য যাহাই জানিতে পারিয়াছি তাহাই গুণমুগ্ধ হইয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। He never dies who lives in the hearts of all—তাঁহার সম্বন্ধে শুধু ইহাই বলিতে পারি।

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এসসি

শ্রীমান ননীগোপাল ১৯১২ সালে গঙ্গানন্দপুর ইউ, পি, স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া ঠাকুরগাঁ হাইস্কুলে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন; তারপর যশোহর জিলায় ইতিনা হাইস্কুলে সপ্তম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ১৫ টাকা বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। তৎপর দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী হইতে ১৯২১ সালে আই-এসসি পরীক্ষায়

২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন; পরে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া বি-এসসি পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন, প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এসসি পড়েন এবং তথায় Astronomical Observatory Student Asst. হিসাবে ২০ টাকা করিয়া সাহায্য পান, ১৯২৬ সালে সবডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হন এবং ঐ সনে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া এম-এসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট-এর চাকরী জীবনেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং গত ১৯৫৭ সালে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনর্নিযুক্ত হইয়া বর্ধমানে Additional Land Acquisition Officer-এর পদে নিযুক্ত হন। রতনদিয়া হাসপাতাল স্থাপনা কালে ইনি ৫০০ টাকা এককালীন দান করেন। তাঁহার এই জনহিতকর কার্য সকলেই অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-বি-বি-এস (কলিকাতা)
এম-আর-সি-পি (লণ্ডন) এফ-সি-সি-পি (ইউ-এস-এ)

শ্রীমান পূর্ণেন্দু স্বর্গত ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র। ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের আত্মীয় ও আমার বিশেষ বন্ধুলোক ছিলেন। তিনি শুধু উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও নির্মল চরিত্রবলে সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তিনি এম-এ, বি-এল ডিগ্রী লাভ করিয়া ৬ বৎসর গোয়ালনন্দ ও ফরিদপুর কোর্টে প্রাকটিস করিয়ার পর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন (১৯০৬ পর্যন্ত); তারপর স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজার আহ্বানে ত্রিপুরা যান এবং রাজস্ব সচিব পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া ১৯২৯ সালে জুলাই মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুও বারাণসী ধামে এক সপ্তাহ পূর্বে ঘটে। অসময়ে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বি-এসসি, একটি ব্যাঙ্কের এজেণ্ট রূপে কাজ করিতেন) খুবই বিব্রত হইয়া পড়েন। স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পূর্ণেন্দুকুমার ও অমিয়কুমারকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর মধ্যেই ইঁহারা যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান হইয়া উঠেন। শ্রীমান পূর্ণেন্দুকুমার আজ কলিকাতার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও অধ্যাপকরূপে খ্যাত।

পূর্ণেন্দুকুমার ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করিয়া ত্রিপুরা স্টেট হইতে বৃত্তি

লাভ করেন এবং কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে আই-এসসি পাস করিয়া উচ্চস্থান অধিকার করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইয়া ২য় বৎসর হইতে ৫ম বৎসর পর্যন্ত কলেজ ক্লাস স্কলারশিপ ও ৫ম বৎসরে মেডিসিনে বিশেষ বৃত্তি পান এবং এম-বি বি-এস পাস করিয়া মেডিসিন-এ প্রথম হইয়া স্বর্ণ পদক পান (১৯৩৬)। পরবর্তী পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার পর ১৯৪৪ সালে এম-আর-সি-পি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে যক্ষ্মা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লইতে গভর্নমেণ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং ইংল্যাণ্ড, কোপেন-হাগেন, স্টকহোলম, অসলো, জুরিখ, জেনিভা, ইটালি ও ফ্রান্সএর বিভিন্ন কলেজে ট্রেনিং লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন (এপ্রিল, ১৯৪৮)। কিন্তু সরকার তাঁহার উপযুক্ত চাকরী দিতে না পারায় ইনি স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ, পোর্ট কমিশনার হাসপাতাল প্রভৃতির সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুক্ত আছেন।

শ্রীঅমিয়কুমার চটোপাধ্যায় এম-এস (করনেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ-এস-এ), পি এচ্-ডি (ইলিনয়েস, ইউ-এস-এ)

হেমন্তকুমারের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয়কুমার যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন উক্ত কলেজে চাকরি করেন, পরে দেশের নানা প্রতিষ্ঠানে ও ম্যানচেষ্টারের একটি এনজিনিয়ারিং (ফেরানটি) কারখানায় মোট চারবারে কাজ করেন। ম্যানচেস্টারে থাকাকালে গত যুদ্ধের মধ্যে অন্ধকার জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্সের পথে দেশে ফিরিয়া আসেন ও পরে অ্যামেরিকায় গিয়া এম-এস ও 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ইনি বর্তমানে রাঁচিতে 'বিড়লা কলেজ অভ টেকনোলজি'র ভাইস-প্রিন্সিপাল। ইনি বিবাহ করেন পরলোকগত বিখ্যাত চিকিৎসক বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী ও জাস্টিস মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পুত্রগণ

অক্ষয়কুমারের মধ্যম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ লাহোর মেডিক্যালে ষষ্ঠ-বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া ফাইনাল পরীক্ষা দেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। তিনি রতনদিয়াতে বেশ বড় রকমের একটি ডিসপেনসারি

খোলেন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পিতা ঐ সময় তাঁহাকে ডিসপেনসারি স্থাপনের জন্য দুই হাজার টাকা দেন এবং বাড়ী ও সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে রতনদিয়াতেই বসবাসের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা ও পরবর্তী কালে ৫০ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। বার্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনিও কাশীবাসী হন এবং ঐ পুণ্যধামেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া যান প্রফুল্লকুমার, তারাকুমার ও ঋষিকুমার।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ

প্রফুল্লকুমার ঝাঁসিতেই হেড মাষ্টারের পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া স্থানীয় কলেজে প্রফেসার এবং পরে অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়া ঐখানেই অবসর জীবন কাটাইতেছেন। ইনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও নানা প্রতিষ্ঠানের নায়ক ছিলেন। ইনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়। ধ্যানচাঁদ সহ হকি টীমের পরিচালক রূপে ঝাঁসি হিরোজ টীম লইয়া ১৯৩২ সালে কলিকাতা আসেন।

স্কুল কলেজ জীবনে গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে প্রফুল্লকুমার প্রতিবৎসর নতুন সংস্কৃতির হাওয়া বহন করিয়া আনিতেন। তিনি স্কুল জীবনেই পাঠ্য বহির্ভূত বহু বিষয় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। প্রতি গ্রীষ্মকালে তিনি অন্তত দেড়মাস গ্রামে কাটাইয়া যাইতেন। সাঁতারের কৌশল ও ফুটবল খেলায় অসাধারণ দক্ষতায় সবাইকে বিস্মিত করিতেন। কাশীতে পড়িতেন। স্কুল জীবন হইতেই পুলিসের সন্দেহ ভাজন ছিলেন। গ্রামে আসিলে পাংশা থানার উপর ভার পড়িত ইহার বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাইতে। একবার পাংশার দারোগা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, "প্রফুল্লবাবু, আপনি ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ করুন, আপনার সঙ্গে থাকিব, ডবল ভাড়া পাইব সরকার হইতে, তাহা হইতে আপনার ভাড়া দিব। বেশ মজা করিয়া দেশ দেখা হইবে।" প্রফুল্ল তাহাতে রাজি হন নাই। একবার কাশী হইতে রতনদিয়া আসিলে পুলিসের লোক তাহার সঙ্গে রতনদিয়া আসিয়াছিল। খুব দুষ্টমি বুদ্ধি ছিল প্রফুল্লর। কাশীতে পুলিস কনস্টেবল সর্বদা সঙ্গে থাকিত, সেজন্য তিনি প্রায়ই সাইকেলে করিয়া সমস্ত শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—এক সঙ্গে হয় তো চার পাঁচ ঘণ্টা। কয়েক দিন পুলিস তাঁহাকে সাইকেলে অনুসরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং প্রস্তাব করিল আর পারিতেছি না, আপনি রোজ একবার দেখা করিয়া

যাইবেন, তাহা হইলেই হইবে। আপনাকে এভাবে অনুসরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রফুল্ল রতনদিয়াতে ১৯১৫ সালে 'অঞ্জলি' নামে হাতের লেখা মাসিক বাহির করিয়াছিলেন। কাশীর মহেন্দ্র রায়ও তাহাতে লিখিতেন। প্রফুল্লকুমার পরিমল গোস্বামীর সহপাঠী ছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র তারাকুমার একজন দেশ প্রেমিক। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে তাঁহাকে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা ও পুলিসী নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বর্তমানে কাশীধামেই নিজস্ব বাড়ীতে বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ ঋষিকুমার (এম-এ) ছিলেন ঝাঁসি স্কুলের শিক্ষক, সম্প্রতি তিনি স্ত্রী ও একটি কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। ঋষিকুমারের মৃত্যু বেদনাদায়ক। তাঁহার ডাকনাম ছিল গোপাল। গোপালের বিভিন্ন দেশের চলিত ভাষা অনুকরণের ক্ষমতা ছিল।

শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বি-এ, বি-টি

অসামান্য প্রতিভা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস তাহার অকাল মৃত্যু তাহার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেয় নাই।

শৈলেন্দ্র রতনদিয়া নিবাসী গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, এবং আমার জামাতা। আমার প্রথমা কন্যা পরিমলবাসিনীর সহিত বিবাহ হয়। শৈলেন পড়িত রাজবাড়ী রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে ১ম শ্রেণীতে। আমি তখন সারা মাড়োয়ারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাহার অসুস্থতার জন্য তাহাকে আমার সারার বাসায় লইয়া যাই। সেখানে বসিয়াই সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় এবং ঐ রাজবাড়ী স্কুল হইতেই পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় (তখন হইতেই শৈলেনের বিবাহ সম্বন্ধে তাহার পিতা গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রস্তাব চলিতেছিল।) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শৈলেন্দ্র উত্তীর্ণ হইবার পর খুব আনন্দের সহিত শুভকার্য সম্পন্ন করি। বিবাহ অন্তে রাজসাহী কলেজে তাহাকে ভর্তি করিয়া আমার বন্ধু সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের (উক্ত কলেজের ইতিহাসে নাম করা প্রফেসর) তত্ত্বাবধানে রাখি। এখানে বলা প্রয়োজন উক্ত কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়ার খরচ আমিই বহন করিয়াছিলাম। উক্ত কলেজ

হইতে শৈলেন্দ্র অনার্স (২য় শ্রেণী) ইংরাজীতে লইয়া বি-এ ডিগ্রী লাভ করে। শৈলেন রাজসাহী কলেজে ভর্তি হইবার কিছু দিন পর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথও সারা মাড়োয়ারী স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রাজশাহী কলেজে যোগদান করে এবং উভয়েই উক্ত সন্তোষ বাবুর তত্ত্বাবধানে থাকে। শৈলেন বি-এ ডিগ্রী লাভ করিবার পর তাহার বন্ধু লক্ষীকোলের কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায়ের সহিত সম্মিলিত ভাবে অন্ধ্র ইনশিওরেন্স কোম্পানীর ব্রান্চ আপিস খোলে কলিকাতায় 'রায় অ্যাণ্ড চাটার্জি' নাম দিয়া। কিন্তু ঐ কোং হইতে চাটার্জি নাম কাটাইয়া তাহাকে রাজবাড়ী আনিয়া রাজার স্কুলে সহকারী হেড্ মাস্টার রূপে চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করি। তারপর তাহাকে পাঠাইয়া দিই ঢাকা বি-টি ট্রেনিং কলেজে। সেখান হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী পাইয়া রাজবাড়ী স্কুলে যোগদান করে। অল্প দিন মধ্যেই শিক্ষকতায় সুনাম অর্জন করে। ডক্টর পি, কে. রায় (ইউনিভারসিটি ইনস্পেক্টর) রাজবাড়ী স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া শৈলেন্দ্রকে একটি ক্লাস পড়াইতে দিয়া তাহার শিক্ষাদান প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন "আমি অনেকগুলি স্কুল পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু এরূপ একজন শিক্ষক দেখিতে পাই নাই—ইঁহার পাঠন প্রণালী এতই সুন্দর যে শতকরা একজনও এরূপ শিক্ষক মিলবে কিনা সন্দেহ।" শৈলেনের শিক্ষা দানের বৈশিষ্ট্য এই—ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক—এই তিনটি বিষয় পড়াইবার সমান অধিকার ছিল—যে যোগ্যতা খুব কম শিক্ষকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া শিক্ষার্থীরাও মুগ্ধ হইত। এবং অতি আগ্রহের সহিত তাহার নিকট প্রাইভেট পড়িতে আসিত।

এই হইল শৈলেনের 'কাল'। অল্পদিন মধ্যেই দলে দলে ছাত্র আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল। স্কুলে ৫ ঘণ্টা কাজ করিয়া বাড়ী আসিবার পর বসিত টিউশনের ক্লাস—৩ 'শিফটে' ১২ টি ছেলেকে (প্রতি শিফটে ৪জন করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল বিকাল রাত্রে প্রাতে। ১০ টাকা করিয়া দক্ষিণা! স্কুলে বেতন পাইত মাত্র ৭৫ টাকা। টিউশন না করিলেই বা সংসার চালায় কি করিয়া? কবি কুপার (Cowper) বলিয়াছেন—Where penury is felt, thought is chained—দারিদ্র্য চিন্তা শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে—বিকাশে বাধা দান করে। সত্যই তার প্রতিভা ও সম্ভাবনা যথেষ্টই

ছিল। কিন্তু প্রতিভা বিকাশের বা সাহিত্য চর্চার সুযোগ বা সময় কৈ? শৈলেনের এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের ফলে রোজ জ্বর হইতেছিল। তারপর ধরিল উদরী রোগে। ভর্তি করা গেল কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ হাসপাতালে—সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। জীবন দীপ নিভিয়া গেল। একটি সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আরও একটি দুর্ঘটনা। বেদনা দায়ক—আমার পক্ষে। শৈলেনের মৃত্যুর মাত্র ২২ দিন পূর্বে আমার কন্যা পরিমলবাসিনীর মৃত্যু হয় সন্তান প্রসবের পর। শৈলেন তখন নিজেই দারুণ অসুস্থ অবস্থায় পূর্ণিয়াতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বাড়ীতে ছিল। তাহাকে এ নিদারুণ সংবাদ দেওয়া হয় নাই। পরে যখন শৈলেন ঐ সংবাদ শুনিল ঐ শোক সহ্য করিতে পারে নাই। সেও পরিমলবাসিনীর অনুগামী হইল।

শৈলেনের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাই প্রথমে যখন সে রাজসাহী কলেজে পড়িত। রাজসাহী কলেজ ম্যাগাজিনে তাহার রচিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম "সবুজ ঘাসের অবুঝ ব্যথা।" কি চমৎকার তার ভাষা ও লিখন-ভঙ্গী; রচনাটি আমার নিকট নাই তবে ভাবটি মনে আছে। ঘাস দুঃখ করিয়া বলিতেছে—আমি দেবদেবীর পূজায় নাকি প্রধান উপকরণ, আমি না হইলে তাঁহারা পূজায় তুষ্ট হন না। আমি মাঠে ময়দানে সুকোমল শয্যা বিছাইয়া রাখি। রাখাল বালকেরা আমায় উপর গা এলাইয়া মনের সুখে গান করে। ধনীর উদ্যানে পার্কেই বা আমার কত আদর। স্বাস্থ্যকামীরা আসিয়া আমার উপরে উপবেশন করেন ও নির্মল বায়ু সেবন করেন। কত যুবক যুবতী আমার সুকোমল শয্যায় বসিয়া হাসির তরঙ্গ বহাইয়া দেন এবং কানে কানে কত প্রেম ভালবাসার কথা পরস্পরে বিনাইয়া বলেন—আমি কান পাতিয়া শুনি। শুভ অন্নপ্রাসন, উপনয়ন বা বিবাহ উপস্থিত হইলে আমার ডাক পড়ে সর্বাগ্রে। আমি চালুনে বিশিষ্ট স্থান পাই; বরকনের আশীর্বাদ কালে আমি তাহাদের মস্তকে ধানের সহিত আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া থাকি। আমার বরণ শ্যাম, তজ্জন্য আমার বর্ণের সহিত শ্যামের তুলনা হয় এবং বলা হয় 'নব দুর্বাদল শ্যাম!' আবার শুনি আমি নাকি একটি মূল্যবান 'ভেষজ'—কাহার হঠাৎ কোন স্থানে কাটিয়া গেলে আমিই জোড়া লাগাইয়া দিই। আচ্ছা বলুন ত আমরা যাদের এত উপকারে আসি তাহা ভুলি। গিয়া মাঠে ময়দানে, পার্কে

আমাদের উপর নির্মম হস্তে রোলার চালায় কেন ও আমাদের মুণ্ডপাত করে কেন? আমাদের কি বেদনা বোধ নাই? ইত্যাদি আরও কত ভাবোচ্ছ্বাস!

শৈলেন মৃত্যু কালে তিনটি সন্তান রাখিয়া যায়। একটি পুত্র ও দুটি কন্যা। তিনটিই শিশু। তাহাদের রক্ষার ভার ভগবান আমাদের হাতেই তুলিয়া দেন। পুত্র (সুহাসকুমার) শিলং এড্‌মণ্ড কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্স ২য় শ্রেণী সহ বি-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ইসলামপুর হায়ার সেকেণ্ডারী মালটি-পারপাস স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে। কন্যা দুটিকেই পাত্রস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি।

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র রতনদিয়ার স্বর্গত হরকুমার রায় মহাশয়ের জামাতা নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। নবীনচন্দ্র উক্ত রায় মহাশয়ের কন্যা ত্রৈলোক্যতারিণীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর প্রদত্ত জমিতে গৃহনির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। প্রবোধচন্দ্র দীর্ঘকাল রেলওয়ে বিভাগে চাকরি করেন। ইনি খুব নাট্যপ্রিয় ছিলেন। সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই তিনি রতনদিয়া গ্রামে অনেক নূতন ভাবের আমদানী করেন। ইতিহাসে তাঁহার আগ্রহ ছিল অসামান্য। বনফুলের বিশেষ প্রেরণাদাতা ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। সাহেবগঞ্জের অন্যান্য সমাজসেবী ও সংস্কৃতি-মান বাঙালীর সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া মানুষ করিয়া তোলেন। প্রথম তিনটি পুত্রই কৃতী। সুনীলকুমার রাজবাড়ী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ জীবনে বিশেষ উন্নতি করেন এবং গৌরবের সহিত ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে ঝাড়গ্রাম গভর্নমেণ্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। দ্বিতীয় মানসকুমার বি-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া সব-ডিপুটির পদে আছেন। তৃতীয় পার্থকুমার বর্তমানে প্রেসিডেন্সী ডিভিশনে অ্যাসিস্টেণ্ট ইনস্পেকটর অভ স্কুলস্। পঞ্চম অমিতাভ ও তিনটি কন্যা। শ্রীমান সুনীলকুমার লেখক হিসাবে অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

আমি যখন রাজবাড়ী স্কুলে শিক্ষকতা করি, তখন শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রের

বিবাহ হয় আমার বন্ধু ও রাজবাড়ীর সরকারী ডাক্তার, শরৎচন্দ্র বিশ্বাস (এল-এম-এস) মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সিরাজগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রামে।

প্রবোধচন্দ্র চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর লিলুয়াতে বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র রেলওয়েতে চাকরি করিয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করিয়া যে পুত্রগণকে মানুষ করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাঁহার এই কৃতিত্বের মূলে তাঁহার সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীর সুনিপুণ হস্তে সংসার পরিচালনা।

অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, এল এম-এফ

অতুলকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই বলিতে হইবে—তিনি একাধারে ছিলেন একজন সু-চিকিৎসক, সু-অভিনেতা, সু-সামাজিক, সমাজসেবী এবং উৎকৃষ্ট ক্রীড়াবিদ্—অর্থাৎ অতুলকৃষ্ণ এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহাকে বাদ দিলে রতনদিয়ার স্মৃতি অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়ে।

ডাক্তারী ব্যবসায় প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছেন তাহার কারণ এই তিনি যখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করিয়া রতনদিয়া আসিয়া 'প্র্যাকটিস' আরম্ভ করেন। তখন ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোন পাস করা ডাক্তার ছিল না। অনেকদিন পর আর একজন পাস করা ডাক্তার আসিয়া ডিসপেনসারি খোলেন—তিনি হচ্ছেন—মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, সুচিকিৎসক ও মিষ্টভাষী বলিয়া তাঁহারও অল্পদিন মধ্যে পশার বেশ জমিয়া ওঠে—আর তাঁহার জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। যে যাহা দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। রোগী 'বার্লি' খাইতে না চাহিলে নিজের ডিসপেনসারি হইতে স্টোভ, প্যান, পেয়ালা চামচ আনাইয়া নিজ হস্তে বার্লি প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং রোগীর অভিভাবককে শিখাইয়া দিতেন কেমন করিয়া বার্লি তৈয়ার করিতে হয়। কলিকাতায় চিত্রশিল্পী রূপে খ্যাত সুধীর মৈত্র ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমার প্রতি অতুলের বিশেষ আনুগত্য ছিল। অতুলের পিতা সারদাচরণ আমার সহপাঠী ছিলেন। তাছাড়া ইনি যখন রতনদিয়ায় প্র্যাকটিস করিতে বসেন, আমিই আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ঘর ইত্যাদি ঠিক করিয়া দিই, কলিকাতা হইতে ৪টি আলমারী আনাইয়া দিই এবং গ্রামে গ্রামে পরিচয় করাইয়া দিই। পুলিস আদালত প্রভৃতি বিষয়ে অতুলকৃষ্ণের একটি

স্বাভাবিক ভীতি ছিল। ইনি মুরারিখোলা গ্রামে এক বাড়ীতে 'কল' পাইয়া যান নাই। সে বাড়ীতে দুইজন আত্মহত্যা করিয়াছে। অতুলকে পুলিস হাঙ্গামায় পড়িতে হয়—'কেসটি' কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। অতুলের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। আমি তখন রাজবাড়ী স্কুলে পুলিসকে ধরিয়া কেসটি মিটাইয়া ফেলি।

রতনদিয়া বাজারে গভর্নমেণ্ট গুদাম হইতে যখন কয়েক শত মন চাউল একরাত্রে উধাও হয় এবং 'আজাদ' পত্রিকায় হেড লাইনে প্রকাশ হয় —"রতনদিয়া চাউলের গুদাম হইতে······মন চাউল উধাও—মোঃ ইউসুফ হোসেন চৌধুরী গ্রেপ্তার—"তখন অতুলের অবস্থা কাহিল। ঐ চাউল ইত্যাদির জন্য একটি 'একসিকিউটিভ' কমিটি ছিল, তাহাতে মেম্বরদের নামের মধ্যে অতুলেরও নাম ছিল। মেম্বরদের মধ্যে কয়েকজন গ্রেপ্তার হন, চৌধুরী সাহেব নিজে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। প্রফুল্ল ভৌমিক (আলফু) ও ধীরেন মুখার্জি (নেতু) ইহারা ছিল দারুণ কৌশলী। ইহাদিগকে আটকায় কে? দুই জনই ঢাকা মেল থামাইয়া তাহাতে চড়িয়া কলিকাতায় চম্পট দেয়। অতুল আসিয়া কাঁদিয়া বলে "মাস্টার মহাশয়—এবার চলিলাম!" আমি সাহস দিয়া বলিলাম—"কিছু হবে না পুলিস কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না যে 'ওয়ার্কিং' মেম্বরদের মধ্যে তুমি ছিলে।" হইলও তাই। অতুল গ্রেপ্তার হল না। এই মোকর্দমার মোড় ঘুরাইয়াছিলেন চৌধুরী সাহেব। এ কেসে ফৌজদারী মামলা চলিতে পারে না, হবে দেওয়ানি—'It is a case of civil nature' গেল ফৌজদারী, এখন চলিতে লাগিল দেওয়ানী—আসামীরা সব খালাস পাইল। এই মোকর্দমায় যত টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা আংশিক সকল মেম্বরকেই দিতে হইয়াছিল। অতুলকেও। শেষ পর্যন্ত মোকর্দমা গেল ফাঁসিয়া। চালও গেল আর এই মোকর্দমার ক্ষতিপূরণ, খরচা গভর্নমেণ্টকেই দিতে হইল। ৩০০০ টাকা, অংশ মত অতুলও কিছু পাইলেন। তখন অতুলের হাসি দেখে কে? ধন্য চৌধুরী সাহেবের 'ব্রেন'!

অতুলের রতনদিয়া ত্যাগের দিনটি এখনও মনে পড়ে। দৃশ্যটি যেমন করুণ তেমনি হাস্যকর। সেটুকু না বলিলে তার সম্বন্ধে বলা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

অতুল যে ভারতে চলিয়া আসিবেন তা মোঃ নজরুল হক

চৌধুরী—ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট জানিতেন এবং ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আটকাইতে পারিতেন। কারণ অতুল হাসপাতালের চাবি কম্পাউণ্ডারের হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। অতুলের স্ত্রী পালকিতে—সদ্যোজাত একটি সন্তান কোলে। হক চেধুরী আসিয়াছেন প্লাটফর্মে—অতুলের যাওয়া দেখিতে। তিনি যেই প্লাটফর্মে আসেন—তাঁর চা-দোকান হইতে, অমনি অতুল চলিয়া যান প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে (তিনি সিগারেট খান ও হাসেন), গাড়া আসিল প্লাটফর্মে অতুল সস্ত্রীক সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন কিন্তু 'বেডিংটা' ছিল এত বড় যে গাড়ীর ভিতর ঢুকিল না। এদিকে গাড়ী দিল ছাড়িয়া, প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে গাড়ী যাইতে না যাইতেই অতুল চেন টানিলেন, গাড়ী গেল দাঁড়ায়ে। প্লাটফর্মের সমস্ত লোক ছুটিয়া গেল ব্যাপারটা কি দেখিতে। লাল মিঞা ও দলবল সহ হাসিতে হাসিতে গেলেন এবং সেই 'অভিশপ্ত' বেডিংটি লোকজন দিয়া লাল মিঞাই গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। শিকল টানের জন্য ১০ টাকা গার্ডকে দণ্ড দিতে হইল। লাল মিঞা হাসিয়া খুন। ডাক্তারের মুখ চুণ। তারপর রানাঘাট ষ্টেশনে—আসিও ঐ গাড়ীতে যাচ্ছিলাম শান্তিপুর আমার বড় ছেলের বাসায় (ধীরেন তখন শান্তিপুর হাসপাতালের এম, ও)। অতুল আসিয়া বলে "মাষ্টার মশায়—আমি ত হাসপাতালের আমি বলিলাম। কম্পাউণ্ডারের হাতে দিয়া চলিয়া আসিলাম কোন বিপদ হইবে না ত?" আমি বলিলাম "তুমি সি, এস্ কে তার করিয়া দাও তোমার বিপদ জানাইয়া। তোমার ভাই থাইসিসে আক্রান্ত, তাহাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে—চাবি কমপাউণ্ডারের হাতে দিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি, চার্জ লইবার ব্যবস্থা করুন দয়া করিয়া।" তাহাই করা হইল। অতুল আর রতনদিয়া যান নাই। অতুলের উচিত ছিল সকলকে বলিয়া আসা তাহা হইলে এরূপ হাস্যাস্পদ অবস্থা হইত না। লাল মিঞা তাঁহাকে কেন আটকাইবেন? যখন হাসপাতাল হইয়াছে ডাক্তার একজন আসিবেই এল-এম-এফ্ হউক বা এম-বি হউক হিন্দুই হউক বা মুসলমান হউক। তাঁহাদের আত্মীয়ের মধ্যেও ডাক্তার আছেন দুই তিন জন।

অতুলের প্রথম পুত্র শ্রীমান সরোজকুমার বেনারস এনজিনিয়ারিং কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত যায়, সেখানে ট্রেনিং লইয়া কিছু কাল চাকুরী করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। এই সময় তাহার

বিবাহ হয়। বর্তমানে দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট-এর ইনজিনিয়ার। সরোজ-কুমার কিছু কাল রাজবাড়ী রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে কাজ করিয়াছিল। ছেলেরা তাহাকে খুবই পছন্দ করিত। সরোজকুমার থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন করিয়া তাদের আনন্দের খোরাক যোগাইত।

অতুলের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে দুর্গাপুরে, ছেলের বাসায় হাইপারটেনশনের দরুন। তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই।

কৌতুক প্রিয়তাও অতুলের কম ছিল না। পথে ঘাটে দেখা হইলেই বলিতেন "মাষ্টার মশাই মোহনপুরে একেবারে লেছেন টেস্ অব্ প্ল্যান্টি-পয়েজ"—তার অর্থ "দারুণ কলেরা লাগিয়াছে মোহনপুরে।" ঐ কথাটি বলিয়াছিলেন—কালিকাপুরের গিরি সান্যাল। ই, বি, রেলের যখন একষ্টেনসন (Extension) হয় গোয়ালনন্দ পর্যন্ত—তখন উক্ত সান্যাল—সাহেবকে ধরিয়া কুলী তদারকের চাকরি লন। ইংরাজী আগে জানিতেন না। কুলীদের লাগিয়াছে কলেরা তাই ঐ কথা বলিয়া সাহেবকে বুঝাইতে যান ব্যাপারটি, সাহেব এক বর্ণও বুঝিতে পারেন না। শেষে সান্যাল মশাই দৌড়াইতে থাকেন আগে আর সাহেবকে সঙ্গে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। সাহেবও তাঁর পিছনে পিছনে যান এবং গিয়া দেখেন কুলীদের মধ্যে কলেরা লাগিয়াছে। তাই ঐ কটি অর্থহীন কথা রতনদিয়ার লোককে এখনও আনন্দের খোরাক যোগায়।

স্বর্গত ব্রজবন্ধু ভৌমিক এস-ডি-ও—গোয়ালনন্দ

সুদীর্ঘ ৪২ বৎসর রাজবাড়ীতে থাকাকালে বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। তন্মধ্যে অনেকের সহিত বন্ধুত্বও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহার কথা বলিতেছি এরূপ একটি চরিত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ইনি হইতেছেন ব্রজবন্ধু ভৌমিক। কিছু দিন রাজবাড়ীতে সেকেণ্ড অফিসার থাকিবার পর ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ইনি যখন সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন তখন হইতেই ইঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বের সুত্রপাত হয়। ক্রমে উহা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। রাজবাড়ীতে ১৫ জন মত সভ্যের একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁহারই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায়। তিনি ছিলেন তাহার প্রাণ-স্বরূপ। (সঙ্ঘ সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা থাকিল)। ইনি আমার সাহচর্য বিশেষ করিয়া পছন্দ করিতেন এবং এমন কি, দ্বিতীয় বার যখন রাজবাড়ী আসিলেন এস-ডি-ও হইয়া

তখনও মাত্র টুইলের সার্ট গায়ে—আসিয়া বসিতেন আমার রাজবাড়ী বাড়ীর বহির্ভাগে দুইটি আম্রবৃক্ষের মধ্যস্থলে চেয়ার পাতিয়া। আমি বলিতাম "আপনি এখন কেউ কেটা নন—মহকুমার হর্তা কর্তা বিধাতা—এ ভাবে এ গরীব খানায় আসিলে লোকে বলিবে কি?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন— "আমার কি একটা প্রাইভেট জীবন নেই? আমি কি সব সময়েই এস-ডি-ও? আমি কি আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাইতে পারিব না?"

পিয়নের স্ত্রীর হইয়াছে কলেরা. সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিলেন পিয়নের বাড়ী। আনিলেন ডাক্তার, লাগিয়া গেলেন রোগিণীর চিকিৎসায়— পরিণাম ভাল বা মন্দ না দেখিয়া বাংলোতে ফিরিতেন না—তা রাত্রি ২ টাতেই হউক বা দারুণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই হউক। কাহারও বাড়ীর শবদাহ হইতেছে না লোকজন বা অর্থ অভাবে—ছুটিলেন সেখানে এবং সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফিরিলেন বাংলোতে।

ইঁহার পিতা ছিলেন পুলিস সুপার—নাম দীনবন্ধু ভৌমিক। ইঁহার পিতাও নাকি পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী হইলেও দীনের বন্ধু ছিলেন, শুনিয়াছি। তাই আমি বলিতাম আপনি পিতৃ-ধারা পাইয়াছেন— "Like father, like son." শুনিয়া হাসিতেন মাত্র।

হৃদয়ে এত কোমলতা থাকিলেও কর্তব্যে ছিলেন কঠোর। একদিনের কথা বলি। আমি স্কুলে, স্লিপ দিলেন "আমি রতনদিয়া যাচ্ছি আপনি গাড়ীর কাছে থাকিবেন।" আমি নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হইল, বলিলেন—একটা মোকর্দমা ধরিয়াছিলাম আসামী দরখাস্ত দিয়াছে সে শয্যাগত—হাজিরা দিতে অক্ষম। এদিকে সংবাদ পাইয়াছেন আসামী বহাল তবিয়তে আছে এবং ঐ মোকর্দমার দিন রাজবাড়ীতেই উপস্থিত আছে। তাহার বাড়ী গিয়া দেখিতে হইবে সে কিরূপ শয্যাগত। দুইজনে কালুখালি নামিলাম—তিনি একজন পিয়ন সঙ্গে করিয়া ছুটিলেন মোহনপুর (কালুখালি স্টেশন হইতে চন্দনা নদীর পারে, দূরত্ব ১ মাইলের। কিছু উপরে হইবে।) আমাকে বলিয়া গেলেন "আপনি বাড়ী যান আমি পরে আসছি।" আমি বাড়ী আসিবার এক ঘণ্টা মধ্যেই আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেখিলেন?" বলিলেন— "আসামীও ঐ গাড়ীতেই রাজবাড়ী হইতে আসিয়াছিল কিন্তু আমরা যে পথে গিয়াছিলাম সে পথে না গিয়া অন্য পথে যায়, আমরাই উহার

বাড়ীতে অগ্রে গিয়া পৌঁছেছিলাম—গিয়া দেখিলাম বাড়ীতে অনুপস্থিত, শয্যাগত নহে।" তারপর যা হওয়া উচিত তাহাই হইল। আসামীর জামিন নাকচ করিয়া হাজত বাসের আদেশ। আমি বলিলাম—"আপনারও কাজ নাই। অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট হইলে কি করিতেন? 'ডেট' ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত।" তিনি বলিলেন—"এ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।"

ডেপুটি বাবুর কীর্তিঃ—তারপর তাঁহার 'কীর্তি' দেখিয়া হাসি রাখিতে পারি না। আমার উঠানে দেখিলেন এক খানি কুঁড়ে ঘর। বুঝিলেন কি জন্য তোলা হইয়াছে। বলিলেন—"ত্রৈলোক্য বাবুর দেখিতেছি আপনিও সেই মান্ধাতার আমলের লোক, আপনাকে সংস্কার মুক্ত করিতেছি—দিন ত একখানা দা'।" দিলাম আনিয়া, লাগিয়া গেলেন কুঁড়ে ভাঙ্গিতে। কাজ শেষ করিয়া বলিলেন—"ঘরে আপত্তি থাকে ত, বারান্দার একদিক বেশ করিয়া ঘিরিয়া দিন।" আমি বলিলাম—"আপনার এ খাটুনি বৃথাই, আসছে সপ্তাহে আসিয়া দেখিবেন যেখানকার ঘর সেখানেই আছে। আমার ৩/৪ টাকা দণ্ড করিলেন মাত্র। আমরা এখনও 'মধ্যযুগে' বাস করিতেছি, জানিবেন।"

এর পর হইল তাঁর স্ত্রী বিয়োগ। খুব অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। ছেলে কয়েকটি ছোট, তাদের লইয়াই হইল সমস্যা। পাঠাইয়া দিলেন দেওঘর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'! নিজে একা থাকিতে লাগিলেন ঠাকুর চাকর লইয়া। প্রতি বৎসরই তাঁর স্ত্রীর 'মৃত্যু তিথি' নিয়মিত রূপে পালন করিতেন ও লোকজন খাওয়াইতেন। একবার আমাকে রাজবাড়ী না পাইয়া রতনদিয়া লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে আনাইয়াছিলেন। রাজবাড়ী হইতে বদলী হইয়া হাওড়া জেলায় আসেন, তারপর বেশী দিন বাঁচেন নাই, শুনিয়াছিলাম।

স্বর্গত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সুদীর্ঘ ৫৭ বৎসর (১৮৮৯—১৯৪৬) একসঙ্গে কৈশোর, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য কাটিয়াছে (ছাত্র জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষকতা পর্যন্ত)। এরূপ দুইটি জীবন খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দুজন তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। আমি আমার মাতুলালয় বেণীনগর (রাজবাড়ী হইতে ৩½ মাইল) উপস্থিত হইয়া রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হইলাম। কিছু দিন পরে যোগেন্দ্রও ঐ বাড়ী আসিয়া আশ্রয় পাইলেন এবং আমার

এক শ্রেণী নীচে ঐ স্কুলেই ভর্তি হইলেন। বেণীনগর ছিল আমার যেমন মামা বাড়ী, যোগেন্দ্রেরও ছিল ঐ বাড়ী তার দূর আত্মীয় বাড়ী। বেণীনগর হইতে বর্ষাকালে স্কুল করায় অসুবিধা হওয়ায় আমি গিয়া উঠিলাম রাজবাড়ী রজনী রায়ের হোটেলে। কিছু দিন পরে যোগেন্দ্রও গিয়া উঠিলেন লক্ষ্মীকোল দুর্গাজয় ঘোষাল (নায়েব) বাড়ী এবং আমি পাস করিয়া গিয়া উঠিলাম কলিকাতা মির্জাপুর এক মেসে—যোগেন্দ্রও পর বৎসর পাস করিয়া কলিকাতা গিয়া উঠিলেন সাগর কান্দী জমিদারের জামাতা বাড়ী। আমি মেস হইতে চলিয়া গেলাম জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী (এটর্নি) মহাশয়ের বাড়ী ও ১ বৎসর পর রাজা সূর্যকুমার গুহরায় মহাশয়ের বাসায়, যোগেন্দ্রও আসিয়া জমিলেন ঐ বাড়ীতে। তখন উভয়েই আবার একস্থানে। তার পর চাকরি জীবন। আমি ১৮৯৯ সালে এম-এ পরীক্ষা দিয়া কিছু কাল পোষ্টাল বিভাগে চাকরি করি। তাহা ছাড়িয়া দিয়া রাজবাড়ী স্কুলে সহকারী হেড মাষ্টার পদ গ্রহণ করিলাম—২ ডিসেম্বর ১৯০০। যোগেন্দ্র বি-এ পাস করিতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে রাজবাড়ী স্কুলে আনিলাম, তৃতীয় শিক্ষকের পদে। ১৯০৬ সনে আমি হলাম হেড মাষ্টার। যোগেন্দ্র সেকেণ্ড মাষ্টার। যোগেন্দ্রের ধৈর্য ছিল অপরিসীম—'রবার্ট ব্রুসের' মত তিনি ৬ বার অকৃতকার্য হইয়া সপ্তম বারে ডিগ্রী লাভ করেন ও সহকারী হেড মাষ্টার পদে উন্নীত হন। এই ভাবে দুই বন্ধু ১৯৪৭ সনের মার্চ পর্যন্ত একসঙ্গে একই স্কুলে কাজ করিয়া গিয়াছি আনন্দের সঙ্গে।

তার পর আমিই প্রথমে করিয়া ছিলাম রাজবাড়ীতে বাড়ী, তাহার কয়েক বৎসর পর যোগেন্দ্রও একটি বাড়ী নির্মাণ করে। বিবাহও হইল দুইজনের নাটকীয় ভাবে। যোগেন দেখিতে গেলেন আমার জন্য একটি পাত্রী—সে পাত্রী না দেখিয়া পাবনা টাউনে অন্য একটি পাত্রী দেখা মাত্র পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। যোগেন্দ্রের যখন পাত্রী পছন্দ হইয়াছে আমার দেখার প্রয়োজন কি? আমি পাত্রী দেখিতে যাই নাই—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখন জীবিত, তিনিই গেলেন ও কথাবার্তা একেবারে পাকা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। তারপর আমার পালা যোগেন্দ্রের জন্য পাত্রী দেখার। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীর কন্যা সরসীবালার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। সূর্যকুমার বাবু মেট্রোপলিটান

কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। উক্ত চাকরি রিজাইন দিয়া তিনি তখন বালুচর ধনপৎ সিং-এর জমিদারীর ম্যানেজার। আমি গেলাম বালুচর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে। পাত্রী আমার পছন্দ হইল না। তজ্জন্য যোগেন্দ্রকেই বলিলাম তিনি নিজে দেখুন। তিনি গেলেন, পাত্রী তাঁহার পছন্দ হইল। শুভকার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আমাদের দুইজনের বিবাহই গ্রীষ্মাবকাশে হইয়াছিল। আমার বিবাহে যোগেন্দ্র আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকিলেন ১৫-২০ দিন, আমিও তাঁহার বিবাহে রতনগঞ্জ (পাবনা) বাড়ীতে গিয়া থাকিলাম ১০-১৫ দিন। কর্মক্ষেত্রে আমরা দুইজনে বহুদিন একসঙ্গে থাকায় স্কুলটির উন্নতি সাধন যেমন সম্ভব হইয়াছিল (আমাদের দুইজনের যুক্ত প্রচেষ্টা ও দৃঢ়পণ না থাকিলে স্কুল বিল্ডিং কিছুতেই সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম না—ইহা অতিসত্য), তেমনি আমাদের উভয়ের পারিবারিক জীবনও যথেষ্ট আনন্দের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে, এরূপ যোগাযোগ—ঈশ্বর অভিপ্রেত বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। অহিভূষণ গাহিয়াছেন—স্রোতের তৃণ-সম ভাসিয়ে ভাসিয়ে—তোমায় আমায় (দাদা) মিলেছি আসিয়ে, আবার কাল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলে যাব!'—যোগেন্দ্র রাজবাড়ী স্কুল হইতে আমার সঙ্গে বিদায় হইবার পর নলিয়া এস, এম, হাই স্কুলে হেড্ মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন এবং তাহার কিছু দিন পরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া যান। এ যাত্রায় আমাকে ফাঁকি দিয়া আগে চলিয়া গেলেন। আবার যে 'কাল স্রোতের টানে' উভয়ে মিলিত হইব না—তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এস্থানে বলা আবশ্যক, অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে যোগেন্দ্রের নাম ছিল সর্বজন বিদিত। ফরিদপুর জেলায় তৎকালে কোন স্কুলে এরূপ একজন অঙ্ক-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন না—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সার আশুতোষ স্বয়ং তাঁহার আবিষ্কৃত 'থিয়োরেম' (Theorem) সম্বন্ধে (যোগেন্দ্রের অনুরোধ ক্রমে) আলোচনা করিয়া যোগেন্দ্রকে তাঁহার অঙ্কের মেরিট (merit) সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জন-সেবা ঃ—যোগেন্দ্রনাথের 'জন-সেবা' সম্বন্ধে কিছু না বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে—তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কিছু কিছু উল্লেখ করিলাম।

রাজবাড়ীতে "সেবা সমিতি" নামে একটি সমিতি গড়িয়া ওঠে—যোগেন্দ্রই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণ-স্বরূপ। উহাতে আনা হইল, ইউরিন্যাল (Urinal) বেড-প্যান, থারমোমিটার ; আইওডিন, তুলা, ব্যাণ্ডেজ, হোমিও-ঔষধ, আরও কত কি। চলিতে লাগিল জন-সেবা। কিন্তু লোকে সেবা পাইতেই ইচ্ছুক—দিতে নহে! কোন উকিল বা মোক্তার বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে—'আহ! ডাকনা সেবা সমিতিকে?' বাড়ীর কর্তা ছুটিলেন। সমিতির মেম্বরেরা—মানে, উপর শ্রেণীর স্কুলের ছেলেরা চলিল শ্মশানে শব কাঁধে করিয়া। বাড়ীর কর্তা নিশ্চিন্ত। কাহারও ডায়্যারিয়া বা কলেরা হইয়াছে—'আনো বেড-প্যান।' দেওয়া হইল সমিতি হইতে। ফিরাইয়া দিবার নামও নাই। কেহ লইলেন থার্মোমিটার—দিলেন ভাঙ্গিয়া। কিন্তু চাঁদা বা নগদ কিছু দিয়া সমিতিকে সাহায্য করিতে নারাজ। এই উদাসীনতার ফলে সমিতি উঠিয়া গেল। তবে যতদিন ছিল, যোগেন্দ্র যতদূর সম্ভব সেবা দিয়া সমিতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

রাস্তায় একটি লোক অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। করিলেন কাঁধে। নিজেই বহিয়া নিয়া গেলেন হাসপাতালে। তবে পাইলেন শান্তি।

বেলগাছি ধাওয়াপাড়া স্টীমার স্টেশনে এক কেরানী বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছে। বর্ষাকাল, জল থৈ থৈ করিতেছে। চলিলেন যোগেন্দ্রনাথ ডাক্তার সঙ্গে লইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য।

আমার মনে পড়ে—আমি তখন সারা স্কুলের হেডমাষ্টার। আমার বাসায় শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ও আরও ২।৩ জনের ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রি। যোগেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া রাজবাড়ী হইতে সারা গিয়া রোগী পার্শ্বে উপস্থিত। ঈশ্বরদি হইতে আড়াই মাইল—৪টি ডাব হস্তে—আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্! এইরূপ অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন জীবন ভরিয়া।

তাঁহার পুত্রের মধ্যে দুইটি জীবিত। শ্রীমান দেবব্রত বি-এ—দমদম আশুতোষ কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে আছেন। দেশের জন্য অনেক কিছুই করিয়াছেন, সেই স্বদেশী যুগে—যাহার জন্য কারাবরণ করিতে হইয়াছিল কয়েক বৎসর। কিন্তু তবুও গভর্নমেণ্টের নিকট সাহায্য বা কর্মপ্রার্থী হন নাই। এই অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষকতায় সুনাম অর্জন করিয়াছেন। সকলেই মুগ্ধ ইঁহার চরিত্র মাধুর্যে। কনিষ্ঠ শিবব্রত স্বাস্থ্যহীন।

দাদাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কাছে রাখিয়া সস্নেহে লালন পালন করিতেছেন। সত্যব্রত ও প্রিয়ব্রত পূর্বেই মারা যায়। একটি মাত্র কন্যা ছিল। তাহার বিবাহ যোগেন্দ্রই দিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ফরিদপুরের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল—পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি-এল
ও তস্য শ্যালক গোবিন্দলাল বাগচী

"হারামজাদা পাজী বেটা লুকলো কোথায় ?"

(ঘটনাস্থল—গঙ্গানন্দপুর)

পূর্ণবাবু তখন যুবক। ফরিদপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। বেড়াইতে আসিয়াছেন শ্বশুর বাড়ী (মৈত্রবাড়ী গঙ্গানন্দপুর গ্রামে—রতনদিয়া হইতে ছোট একটি মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।) পূর্ণবাবু ও গোবিন্দ (শ্যালক) উভয়ে খেতে বসিয়াছে। আহারের শেষভাগে গোবিন্দের স্ত্রী পূর্ণবাবুর মস্তকে ২।৪ ফোঁটা 'পায়েস' (পরমান্ন) দিয়াছেন কৌতুকচ্ছলে ; গোবিন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। পূর্ণবাবুর আহার শেষ হইবার ২।৪ মিনিট পূর্বেই গোবিন্দ উঠিয়া গিয়াছে এবং হাতমুখ ধুইয়া একটু আড়ালে লুকাইয়া আছে একখানি ধারাল অস্ত্র হাতে। গোবিন্দের স্ত্রী পূর্ণবাবুর হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন—আর যায় কোথা ! গোবিন্দ আসিয়া পূর্ণবাবুর কপালে বসিয়ে দিল অস্ত্র। আনো ডাক্তার, আনো জল, কর ব্যাণ্ডেজ—হুলস্থুল পড়িয়া গেল বাড়ীতে। গোবিন্দ উধাও। কোথায় পলাইয়া গেল খোঁজ নাই। তখন আমাদের গুরু মশাই ছিলেন নিবারণ চট্টোপাধ্যায়, ছড়া বাঁধিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অমনিই গান রচনা করিয়া ফেলিলেন। আমাদের ছেলেবেলার কথা, —ছড়াটিও দীর্ঘ। ২।৪ লাইন মনে আছে মাত্র। তখনকার দিনে সকলের মুখেই শোনা যাইত—"হারামজাদা, পাজি বেটা, লুকলো কোথায় ?"

হানিল কপালে দা সবাই করে হায়, হায়,
হারামজাদা, পাজি বেটা, লুকলো কোথায় ?
আনো জল, আনো ডাক্তার, সবার মুখে বোল,
বাড়ীতে পড়িয়া গেল, ভীষণ গণ্ডগোল ॥
ধরা যখন পড়ল 'শালা' পড়ল হাতে বেড়ী,
আনন্দেতে সবাই মিলে বল হরি, হরি ॥

'চন্দ্রের' কলঙ্ক তবু মুছিল না আর,
কবিতা রচিল শ্রীব্রজরাম কাহার ॥

[এখানে 'হারামজাদা'—গোবিন্দ ; 'শালা'—গোবিন্দ, 'চন্দ্র'—পূর্ণচন্দ্র মৈত্র—উকিল ; ব্রজরাম কাহার—নিবারণ চাটুর্যে (গুরু মশাই) ; তিনি ছদ্মনামে কবিতা রচনা করিয়াছেন। ব্রজ কাহারকে আমি দেখিয়াছি—আমাদেরই গ্রামে বাস ছিল। খুব লম্বা, শক্তিমান পুরুষ—ডুলী পালকী বাহক ; চন্দ্রের যেমন কলঙ্ক আছে, পূর্ণবাবুরও কপালের দাগ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল দেখিয়াছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হইলেই বলিতাম—'এ হচ্ছে আপনার মধুর স্মৃতি-চিহ্ন'] গোবিন্দ বাগচী—পরে উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। আমরা দেখিতে গেলে হাসিতেন—'একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি'—এইরূপ ভাব।

স্বর্গত জানকী ভট্টাচার্য

[জে, এন, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সনস্—ভাট্টা, পুর্ণিয়া]

"দৃষ্টি যার স্থির, পদক্ষেপ যার সুচিন্তিত, আদর্শে যে ঐকান্তিক, বাক্যে যে স্পষ্ট, ব্যবহারেতে যে রম্য, বন্ধুত্বে যে সহৃদয়—তার বহুজন আকাঙ্ক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।"—"অগ্নি-কণা"—ভাস্কর ভট্টাচার্য।

আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গত জানকীনাথ ভট্টাচার্যের জীবনে ঐ মহাজন বাক্যটি সার্থক হইয়াছে। মাত্র এনট্রানস্ পাস করিয়া ৬০ টাকার কেরানীর জীবন সুরু করিয়া আদর্শে ঐকান্তিক, লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া স্বীয় ধৈর্য ও অধ্যবসায় বলে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে পরিশেষে কিভাবে জয়ী হইয়াছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণী হইতেই প্রকাশ পাইবে।

আমরা কৈশোরে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া দুইভাই 'স্রোতের তৃণসম' ভাসিতে ছিলাম। সেই সময় আমাদের গ্রামের স্বর্গত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার দাদাকে নাটোর লইয়া গেলেন (তিনি তখন নাটোরের এস-ডি-ও) এবং নাটোর হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐ স্কুল হইতেই এনট্রানস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আমি পাইলাম লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীর রাজা সূর্য্যকুমার গুহরায় মহাশয়ের নিরাপদ আশ্রয় এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউসন হইতে ঐ বৎসরেই এনট্রানস্ পাস করিলাম। তখন দাদা বলিলেন "আমি পাস করিলাম

তৃতীয় বিভাগে আর তুই প্রথম বিভাগে। তুই পড়, আমি চাকরি করি ও তোকে পড়াই।" হইলও তাই। দাদা গেলেন উক্ত ডেপুটির (ঠাকুরদার) সঙ্গে পূর্ণিয়া। সেখানে অক্ষয় বাবুর বদলির আদেশ আসিয়া গিয়াছে। অক্ষয় বাবু দাদাকে সেস্ রিভ্যালুয়েশান অপিসে কাজ দিলেন। আমি কলিকাতা আসিয়া 'মেস' এ উঠিলাম। দাদা ঐ চাকরিতে থাকিয়া দুই বৎসর মধ্যে মাত্র ৫০০৲ টাকা হাতে করিতে পারিলেন এবং তাহা দ্বারা এক খানি ছোটখাট দোকান দিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথকে আনিয়া ঐ দোকান পরিচালনার ভার দিলেন। ঐ দোকানে থাকিত কাপড়, কাটা কাপড়, স্টেশনারী ইত্যাদি। আসিল স্বদেশী যুগ। দোকান (জে, এন, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোং) তখন বড় হইয়াছে। যথেষ্ট কাপড় আমদানী করা হইয়াছে—ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের 'দিশী' বস্ত্র এবং বিলাতীও কিছু কিছু আছে। স্বদেশী যুগ আরম্ভ হইতেই ঐ দেশে বিলাতী বস্ত্র হইল অচল। তখন পূর্ণিয়ার ডি-এম রোজ আসিতে লাগিলেন দাদার দোকানে—দেখিতে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় হয় কি না! দেখিলেন একখানিও না। তখন রাগ গিয়া পড়িল দাদার উপর। তাঁহাকে অফিসে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখুন জানকী বাবু ইউ মাষ্ট গিভ আপ ইয়োর সপ্ অর রিজাইন ইয়োর পোষ্ট (you must either give up your shop or resign your post)" দাদা ছিলেন স্পষ্ট ভাষী, তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দোকান ছাড়িয়া দিলেও বিলিতি কাপড় কেউ কিনিবে না। এ ক'দিন দেখিলেন ত, সকলেই দিশী কাপড় চায়, তাছাড়া দোকান আছে আমার ছোট ভাই যদুনাথের নামে।" "তাহ'ক, তুমি ভেবে দেখ— কি করিবে, আমি তোমাকে সাত দিনের সময় দিলাম।" সাত দিন পর দাদা গেলেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি ঠিক করিলে ?"

দাদা উত্তর দিলেন, "এই নিন রেজিগনেশন লেটার।" সাহেব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুমি ১৩ বৎসর চাকরি করিয়াছ আর ১২ বৎসর পর পাবে পেনশন। এটা কি ঠিক হইল ?" দাদা বলিলেন, "সাহেব, অনেক চিন্তা করার পরই আমি রিজাইন দেওয়া কর্তব্য স্থির করিয়াছি। সামান্য একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর চাকরি খাইবার জন্য যদি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এতদূর আগ্রহী হন সে স্থলে 'রিজাইন' দিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া বরং

ভাল।" তিনি সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া আসিলেন। সাহেব ভাবিতে লাগিলেন গালে হাত দিয়া।

শাপে হইল বর। তখনকার দিনে পুর্ণিয়ার জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, বি-এল ছিলেন পুর্ণিয়ার নাম করা উকিল। তাছাড়া ডাক আসিত পাটনা হাইকোর্টের বড় বড় মামলায়। বাগ্মিতায়ও তাঁহাকে দ্বিতীয় 'স্যুরেন ব্যানার্জি' বলা হইত। কোনও সভা 'মিনমিন' করিয়া চলিতেছে, যেই জ্যোতিষ বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন আর কি উত্তেজনা সভায়! তাঁহার বক্তৃতাকালে "পিনড্রপ সাইলেনস্" (Pindrop Silence) বিরাজ করিত। তিনি দাদাকে খুব ভাল বাসিতেন। তিনি পরামর্শ দিলেন দাদাকে চাকরি ছাড়িয়া দিতে। বলিলেন আমরা সকলে চেষ্টা করিলে তোমার দোকান এক বৎসর মধ্যে ফাঁপিয়া উঠিবে। আর করিলেন কি—ঐ সাহেব (ভ্যাস্ সাহেব?) পূর্বে যে যে জেলায় ছিলেন সেখানকার ও পুর্ণিয়ায় সাহেবের কীর্তিকলাপ সম্বলিত রিপোর্ট পাঠাইয়া ঐ সাহেবকে পূর্ণিয়া হইতে অপসারিত করিলেন।

ঐ সময় হইতে দোকান সত্যই ফাঁপিয়া উঠিল। সকলের মুখেই—'চল জানকী বাবুর দোকানে। ঐখানে সব মিলবে'। তখন আর ডি-এম আসেন না পাহারা দিতে, আসিতেন জ্যোতিষ বাবু বহু দল সহ। যে ঘরে দোকান বসিত উহাতে জিনিষপত্র ধরে না। করিলেন নূতন বাড়ী। তারপর বসবাসের জন্য নিজের একতলা বাড়ী। এই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রনাথ কটক মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করিয়া পূর্ণিয়া আসিয়া প্র্যাকটিস সুরু করে। দাদা তাহার জন্য একটি ভাল ডিসপেনসারি করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে কয় হাজার টাকার ঔষধ আনাইলেন। ঠিক এই সময়ে হইল তাঁর জীবনাবসান। টেলিগ্রাফ পাইয়া ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখি তাঁহার নিউমোনিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন। স্থানীয় সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তারেরা বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চলিয়া গেলেন নিত্যধামে। মৃত্যুকালের দৃশ্যটিই বা কি করুণ ও মর্মস্পর্শী! তাঁহাকে শহরের সকলেই যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, তাঁহার মধুর ব্যবহার ও জনসেবার জন্য প্রায় ৩০০ লোক আসিয়া পড়িলেন ঐ দুঃসংবাদ শোনা মাত্র। সকলেরই চোখে জল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে গুরুতর

দায়িত্ব আসিয়া পড়িল এবং তাহাকে দারুণ ভাবে বিব্রত করিয়া তুলিল। বাড়ী অর্ধসমাপ্ত। ঔষধের বাকস ডিসপেনসারি ঘরে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ঔষধের জন্য কিছু ঋণও হইয়াছে, পিতৃশ্রাদ্ধও 'যেনতেন প্রকারেণ' করিলে চলিবেন না। অন্ততঃ একহাজার লোকের ভোজের আয়োজন করিতেই হইবে —তার পর নিজের 'প্র্যাকটিস' এর চিন্ত—but he was equal to the task—বয়সে কাঁচা হইলেও বুদ্ধি ছিল প্রখর। অল্প দিন মধ্যেই সব গুছাইয়া ফেলিল। একজন এম-বি ডাক্তার (বিভূতি বাবু) অসিয়াছিলেন পূর্ণিয়ায় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে। তাঁহাকে বসাইয়া দিল ডিসপেনসারিতে যে পর্যন্ত না সে সবদিক গুছাইয়া লইতে পারে। দালানের কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল ; মধ্যম ভ্রাতা মণীন্দ্র দোকান দেখিতে লাগিল। তারপর অমরেন্দ্র একখানি বৃহৎ বাড়ীর কাজে হাত দিল, যাহাতে থাকিবে দোকানের বিভিন্ন বিভাগ—কাপড়, কাটা কাপড়, স্টেশনারি ; ডিসপেনসারি, ঔষধ, এমন কি মদের দোকান পর্যন্ত। ঐ সময় পূর্ণিয়া ভাট্টা পল্লীতে একটি খুব বড় দোকান ছিল সাহা অ্যাণ্ড কোং্র--তাঁহাদের বিরাট কারবার। মদ, বরফ, ও অন্যান্য জিনিষের, তাঁহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলা সহজ কথা নয়—কিন্তু অমরেন্দ্রের ছিল দুর্জয় সাহস ও মনোবল। অল্পকাল মধ্যেই জে. এন, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সনস্—ফাঁপিয়া উঠিল। বর্তমানে ব্যবসায়ে লক্ষ টাকার উপর খাটে, যদিও আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র ৫০০৲টাকা সম্বল লইয়া।

অমরেন্দ্ররা তিন ভাই। দাদার প্রথম পক্ষের দুই পুত্র অমরেন্দ্র ও মণীন্দ্র, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শৈলেন্দ্র। শৈলেন্দ্রও এল-এম-এফ। বিরাটনগরে প্র্যাকটিস করে। অমরেন্দ্রের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও অরবিন্দ দুইজনেই এম-বি ডিগ্রী পাইয়াছেন। মণীন্দ্রের পুত্র চন্দ্রনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এসসি অধ্যয়ন করিতেছে। শৈলেন্দ্রের দুই পুত্রই অপ্রাপ্তবয়স্ক। পূর্ণিয়ার বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। দাদার সকল কন্যারই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনী ভাগ্যদোষে বিধবা। মণীন্দ্রের কন্যার বিবাহ হইয়াছে শিলিগুড়ির এক ধনীগৃহে।

মনে পড়ে. দাদা একদিন আমাকে বলিয়া ছিলেন—"তুমি ত স্কুলে কাজ করিয়া মাত্র ১০০৲টাকা পাও। উহা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া এস—ফরবেশগঞ্জে তোমাকে 'ঘি' এর দোকান করিয়া দিই। পরবর্তী মাসের পয়লা তারিখে

তুমি দোকান হইতে ১০০৲টাকা করিয়া তোমার নামে খরচ লিখিও তাছাড়া ব্যবসায় চলার সঙ্গে সঙ্গে আয় ত বাড়িবেই। কেমন?" আমি বলিয়া ছিলাম—"না. দাদা আমি করিতেছি মাষ্টারী—ব্যবসা চালাইতে পারিব না। হয়তো একদিন 'গণেশ কাত' করিয়া দেবো। যা আছি, তাই থাকি, আমি বেশ সুখে আছি।"

আমার প্রতি দাদার স্নেহ ছিল অপরিসীম। আমার কন্যাদায়ের সময় পূর্ণিয়া হইতে দাদা আসিলেন ১ টিন ঘি, ১ বাণ্ডিল কাপড়, বড় দুইটি রুই মাছ ও নগদ টাকা সহ। আমি আমার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীর বিবাহ দিলাম। রাজবাড়ী আসিয়া দাদা ঐসব জিনিষপত্র বাদে নগদ, ৪০০৲ টাকা আমার হাতে দিলেন। আমি বলিলাম শ্রীমতীর বিবাহে কোন 'পণের' প্রশ্ন নাই। আমি প্রত্যেক মেয়ের নামে পাসবহি করিয়া কিছু কিছু রাখিয়াছি। টাকার দরকার নাই। তিনি উত্তর দিলেন "আচ্ছা হাত পাত, আমি যে ক'দিন আছি এ দায় তো আমারই।" শুভকার্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া তিনি পূর্ণিয়া চলিয়া গেলেন। প্রথমা কন্যার বিবাহেও ঐরূপ করিয়াছিলেন রতনদিয়া আসিয়া। পূর্ব জন্মের ভাগ্য ফলেই আমার ঐরূপ অগ্রজ লাভ হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্ণিয়ায় জনপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রগত মাধুর্য ও জনসেবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক কর্মচারী যাইবেন মফঃস্বলে দূর গ্রামে। বলিয়া গেলেন 'জানকীদা আমি ত চলিলাম ক'দিনের মত দেখাশুনা ক'র ওদিগকে'—ঐ থেকে দায়িত্ব আসিয়া গেল তাঁহার স্কন্ধে। আহার নাই নিদ্রা নাই ঐ বাড়ীতে আছে রোগী, চিকিৎসা ও পরিচর্যা চলিতে লাগিল। বাড়ীর কর্তা উপস্থিত থাকিলে যা করিতেন তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। এক গরীব ভদ্রলোক আসিয়াছেন পূর্ণিয়ায় কোন বাসায় আশ্রয় লইয়া কন্যার বিবাহ দিয়া যাইবেন। সকলেই দেখাইয়া দিল জানকী বাবুর বাড়ী। দাদা অমনিই সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে লইলেন এবং যেন নিজের কন্যারই বিবাহ দিতেছেন—এইভাবে শুভকার্য সুসম্পন্ন করাইয়া দিলেন। ব্যয় হইয়া গেল কয়েকশত টাকা, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে মোটা আকারের একখানি বহি হইয়া যায় এইজন্য তাঁহার কর্মময় জীবনের সামান্য কিছু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পরিবেশন করিলাম।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য দাদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমবাসিনী জীবিতা। তিনি আজকাল অধিকাংশ সময়েই বিরাটনগরে পুত্র শৈলেন্দ্র-নাথের বাসায় থাকেন। পূর্ণিয়ায় তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে ও জন-সেবার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। রোগী-পরিচর্যায় তিনি তাঁহার স্বামীর পদাঙ্ক বরাবর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তিনটি পুত্রের উপরেই সমভাবে স্নেহ-পরায়ণা, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

সামান্য ৫ শত টাকার একটি ক্ষুদ্র দোকানকে যে লক্ষ টাকার একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইতে পারে (যদি থাকে সততা, মনোবল, দুর্জয় সাহস ও অধ্যবসায়) তাহার দৃষ্টান্ত এই জীবনী হইতে পাওয়া যাইতে পারে। ধৈর্যহীনেরা ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নিশ্চয়ই।

সব হারানোর অবুঝ ব্যথা

(স্বকীয়)

ছেলেদের বাড়ীতে থাকি। খাই, দাই, বেড়াই, ঘুমাই। কোন অভাই নাই। খাওয়া পরা সেবা যত্নের কোনও ত্রুটি নাই। তবুও সেই ছেড়ে আসা গ্রামের কথা সর্বদা মনে পড়ে কেন, মন বেদনায় ভরে উঠে কেন? —কারণ স্পষ্ট। যে মাটিতে যে জলহাওয়ায় বাল্য কাল হইতে বর্ধিত হইয়া আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি সেই জন্মভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলাকে কি কখন ভোলা যায়? কবিগুরু বলিয়াছেন—"স্তব্ধ অতল, দীঘি কালোজল, নিশীথ শীতল স্নেহ"—পল্লীর সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর নীরব কালো দীঘির মধ্যে যে স্নেহ লুকাইয়া আছে, সেই স্নেহের টানে মনটি গিয়াছে হারাইয়া। সর্বদাই মনে হয়, তেমনটি আর কোথায় পাবনা। যাদের সাহচর্যে বাল্য কৈশোর যৌবন কাটাইয়াছি—মানিক রায়, বসন্ত রায়, নৃপেন রায়, অম্বিকা রায়, ব্রজেন রায়, ললিত ভট্টাচার্য প্রভৃতি তাঁরা সবাই স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত যাঁরা রতনদিয়ায় ছিলেন তাঁরাও ত আমারই মত পাকিস্তানের ঝড়ে ছন্নছাড়া হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন ত—তাঁরা কি বলিবেন—'বেশ সুখে শান্তিতে আছি?'—আমি বলিব,—না—তাঁদেরও মনটি আমারই মত হাহাকার করিতেছে।

যে আনন্দের দিন চলিয়া গিয়াছে অর্থের বিনেময়ে যে সে আনন্দ

ফিরে পাওয়া যায় না। তার দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যেই অনেক আছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন, শ্রীমান পরিমল গোস্বামীকে। তিনি কি সেই রতনদিয়ার আনন্দের আস্বাদ কলিকাতা বসিয়া পাইতেছেন? তবে তিনি একজন নামকরা সাহিত্যিক। বিভিন্ন সাহিত্য চর্চার মধ্যে তিনি ডুবিয়া আছেন। সঙ্গীও সব সাহিত্যিক। তাঁর চিন্তা অনেকটা ভিন্নপথগামী হইয়া থাকিবে। তবু কি সেই অতীতের স্মৃতি সাড়া দেয় না? সে এক পরিবেশই ছিল স্বতন্ত্র। এমন কি সেই আরব্যোপন্যাসের দৈত্য আসিয়া একরাত্রে আমাদিগকে যদি সেই বাস্তভিটের বাড়ীতে বসাইয়া দেয় (সেই ভিটেই কি আজ আমাদের আছে?) এবং আমরা কাকের ডাকের সঙ্গে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি আমরা যেমনটি ছিলাম তেমনটিই আছি—তাহা হইলেও মনে হয় সেই দিনের আনন্দ আর ফিরিয়া পাইব না।

আজ কোথায় সেই 'দাক্ষায়ণী'? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"দাখ্যা, তুমি নাকি পাংশা গিয়েছিলে যাত্রাগান শুনিতে?" সে উত্তর দিয়াছিল "হ্যাঁ—দাদা।" প্রশ্ন করিলাম "কি পালা হইল?" সে বলিল "তাতো বলিতে পারিব না, সকলেরই মুখে শুনি—"গজেন ভূঁয়ে।" (গজেন দত্ত মনোমোহন থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন কিছু দিন। পরে দেশে গিয়া যাত্রা দলে যোগ দেন। তাঁর খুব নাম হয়—আর জিতেন্দ্র ভৌমিকের ছিল একটি 'ড্যানসিং পার্টি'। ভৌমিককে ভুঁইয়া বলা হয়। এই দু জনের নামের সংযোগ হইয়াছে—"গজেন ভূঁয়ে"।) আমি হাসিয়া মরি!

শ্রীমান প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের (সুকুমার) গ্রেফতার উপলক্ষে রতনদিয়া তখন পুলিসে ছাইয়া গিয়াছে। লালপাগড়ী দেখিলেই "ঐ এল, ঐ এল"—যার যার ঘরে পলায়ন। কিন্তু ননীবালা (দাসুর ভগ্নী) ও খুদি (শ্রীমান প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী) দমিবার পাত্রী নয়। দুর্জয় তাদের সাহস, খুদি দাঁড়াইয়া আছে কালীবাড়ীর নিকটে রেল লাইনের ধারে। একজন পুলিস অফিসার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখানে কেন?" সে উত্তর দিল, "রেল লাইনের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিলে 'অ্যারেস্ট' করিবার আইন আছে নাকি? গাড়ীতে আমার এক আত্মীয় আসিবেন, তাঁহাকে দেখাও কি দোষের?" দারোগা চুপ। ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন! ননী ঠাকুরাণী ও তার মাতা, রেণুর মাতা, মানিক রায়ের স্ত্রী ইঁহাদের দাপটে গ্রাম খানি জমকাইয়া থাকিত। তাঁহারা ত এখনও

জীবিতা। তবুও কি এই কঙ্করাকীর্ণ দেশে নূতন পরিবেশে সুখী হইতে পারিয়াছেন? 'জীবন্মৃত' হইয়া আছেন বলা চলে।

কি আশ্চর্য মোহের টান দেশমাতৃকার প্রতি। অন্যের কথা বলিয়া কি হইবে? নিজের কথাই বলি। আমার আজকাল অবসর যথেষ্ট, ঐ সব অতীতের কথা, সেই হারান দিনের কথা—ছেড়ে আসা গ্রামের কথা দিন রাত ভাবি ও রাত্রে স্বপ্ন দেখি। আমি যেন রাজবাড়ী বা রতনদিয়া স্কুলে বসিয়া পড়াইতেছি, কখনও দেখি লক্ষ্মীকোলের রাজা প্রকাণ্ড এক রুই মাছ পুকুর থেকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। কখনও দেখি আমাদের সেই রাজবাড়ী সংঘের বন্ধুরা আসিয়া আমার বাসায় আসর জমাইয়াছেন। কখনও শরৎ বাবু (উকিল) আসিয়া খুড়ো খুড়ো বলিয়া ডাকিতেছেন—বাহিরে আসিয়া দেখি তিনি হন্ হন্ করিয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। ঘুম ভাঙ্গিলে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসি—মন বিষাদে ভরিয়া ওঠে। তখন মনে পড়ে বনফুলের সেই কবিতা—

পথের বাঁকে দেখা হল
কত লোকের সঙ্গে,
কত হাসি, কত কাঁদন
কত রকম রঙ্গে।
একটু পরে থাকব না কেউ
থাকবে খালি শূন্য,
আর থাকবে স্মৃতির কোঠায়
মেলা মেশার পুণ্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইঁহাকে মাত্র দুইবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। একবার বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশনে যখন তিনি তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরিলেন অধিবেশনের সুরুতে "বন্দে মাতরম্—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং" ইত্যাদি তখন তাঁহার সঙ্গীতের মুর্ছনায় বিরাট জন-সমাবেশ হয় এবং নীরব নিস্পন্দ ভাবে শ্রোতৃবৃন্দ সঙ্গীতসুধা পান করেন।

আর একবার তাঁহার জোড়াসাঁকো ভবনে আমরা বি-এ ক্লাসের কয়েকটি ছাত্র গিয়াছিলাম তাঁহার কাছে—Palgrave's Golden Treasury

হস্তে। তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, দয়া করিয়া Shelley-র "Loves' Philosophy-র The fountain mingles With the Sea— এই কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করিয়া দিন গানের ছন্দে। একটু দেখিয়া লইয়া বলিলেন, লেখ—

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সনে
তটিনী ছুটিছে সাগর পানে,
পবনের সনে মিশিছে পবন,
চির সুখময় আমোদ ভরে।
ঐ দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে ফুল-বালারে, কেবা না দুষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি?
জগতে কেহই নহে কো একেলা,
সকলই বিধির বিধান গুণে,
একের সহিত মিলিছে অপরে,
আমি কেন না বা তোমারই সনে?

—সবটুকু মনে নাই ঠিকভাবে, যে-টুকু মনে আছে তাহাতে সন্দেহ হইতেছে ঠিক লেখা হইল না।

কবির বয়স যখন ৮০ পূর্ণ হইল, তখন মহাত্মা গান্ধী তাঁকে তার করিলেন :—

"Congratulations. Fourscore is not enough, may you finish five.—Gandhi."

কবি উত্তর দিলেন—

—"Thanks for your message. Fourscore is impertinent, five will be intolerable.—Rabindranath.

মিঃ ডব্‌লিউ, সি, বনার্জি (বার-এট-ল)

(উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৮৯৫। আমি যখন এফ-এ পড়ি তখন কিছুদিন বিডন স্ট্রীট নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে (স্বর্গত) জয়কৃষ্ণ গাঙ্গুলী এটর্নি মহাশয়ের বাড়ী থাকিয়া তাঁহার ছেলে শ্রীমান বিজনকে পড়াইতাম। ঐ সময় প্রায় প্রতি রবিবার

বনার্জি সাহেব আসিতেন ঐ বাড়ীতে তাঁহার ভগ্নীকে দেখিতে (জয়কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রীকে) এবং বেশ সাজান একটি ঘরে টেবিল, চেয়ার সাজাইয়া তাঁহাকে খাবার দেওয়া হইত। চিংড়ি মাছ ছিল তাঁর অতি প্রিয় খাদ্য। তাঁহার বোন আমাকে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি এত অল্প বয়সে 'এনট্রেনস্' পাস করিয়াছি শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"good, বাঁচিয়া থাক বাবা।" এইরূপ প্রায় প্রতি রবিবারই তাঁর মত একজন খ্যাতনামা মনীষীকে প্রণাম করিবার ও আশীর্বাদ লাভের সুযোগ হইত। কি সুন্দর চেহারা! যেমন গৌরবর্ণ, লম্বা চওড়া পুরুষ, তেমনি পাকা লম্বা দাড়ি—দেখিলে বুঝিবার যো নাই যে তিনি 'য়ুরোপীয়' নহেন।

তিনি কাজকর্মে খুব সময়-নিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু একদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। স্টার থিয়েটারে দেবেন বক্তৃতা—শ্রোতা গিজগিজ করিতেছে, ৫।৫ মিনিট বিলম্ব হইতে পারে—আর যায় কোথা! শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে পাখীর ডাক, শিস ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এমন সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন "Gentlemen, old age has privileges—I am an old man and may well claim that privilege."—তার পর দিলেন বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনিয়া সকলে অবাক। যেন খাঁটি সাহেবের মুখ থেকে কথা বাহির হইতেছে। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ যাকে বলে তাই। যাঁরা টিটকারি দিতেছিলেন তাঁরাও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

তিনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। শিক্ষাদীক্ষা সবই বিলাতে, সেখানেই মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু মাতৃভূমির উপর টান ছিল এত অধিক যে দেশে স্বাধীনতা আনিবার জন্য সারা জীবন লড়াই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেখিয়া যাইতে পারেন নাই যে তাঁহার চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসিয়া গিয়াছে। তাঁর স্বপ্ন বৃথা যায় নাই।

অম্বিকাচরণ মজুমদার, এম-এ, বি-এল

GRAND OLD MAN OF FARIDPUR

এ কথাটি বলিয়াছিলেন লর্ড কারমাইকেল বাংলার গভর্নর, যখন তিনি ফরিদপুর পরিদর্শনে যান এবং অম্বিকা বাবু তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্পেশাল স্টীমারে দেখা করেন এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের জন্য লাট সাহেবের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। যতদূর মনে হয়,

উক্ত কলেজের জন্য বাইশ রশির জমিদার রাজেন্দ্র বাবু ৫০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। লাট সাহেব গভর্নমেণ্ট হইতে মঞ্জুর করেন ৫০ হাজার টাকা। ১ লক্ষ টাকায় কলেজটি স্থাপিত হয়। অম্বিকা বাবুকে দেখা করিবার জন্য মাত্র ২০ মিনিট সময় দেওয়া হইয়াছিল। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সাহেবের 'এডিকং' অম্বিকা বাবুকে বলেন—"টাইম ইজ ওভার।" তদুত্তরে অম্বিকা বাবু বলেন "ইয়েস আই নো দ্যাট—মাই টাইম ইজ নট লেস্ ভ্যালুয়েবল।" লাটসাহেব হাসিতে থাকেন। কথা সত্যই তো—অম্বিকা বাবুর তখন পশার এত বেশী যে তিনি ফরিদপুরেই কোন 'কেস' হাতে লন না ১০০ টাকার কমে; মফঃস্বল দূর পাল্লার কোন মহকুমায় বা জেলায় গেলে ২০০ টাকার কমে যান না।

বিডন স্কোয়ারে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 'ডেলিগেট'রা মুগ্ধ হন এবং একজন মন্তব্য করেন "হু'জ দিস্ জেণ্টলম্যান হু হ্যাজ আউটপাস্ট মিস্টার বনার্জি?" ওকালতিতে যেমন ছিল নাম ডাক—তদ্রূপ ছিল বক্তৃতায়।

ইঁহার সহিত পরিচিতি লাভ করি রাজা সূর্যকুমার রায়ের মাধ্যমে। ইনি ছিলেন উক্ত রাজার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, অবসর পাইলেই রাজবাড়ী আসিতেন। সেই সূত্রে রাজার শ্যালক ও আমার, অম্বিকাবাবুর ফরিদপুরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। এমন কি, তাহা হইতে ক্রমে ভালবাসা গড়িয়া ওঠে। অম্বিকা বাবু ও তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূরা কলিকাতা যাতায়াত কালে আমার বাড়ীতে আসিয়া উঠিতেন; আমিও ফরিদপুরে গিয়া অগ্রে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উঠিতাম। আমার পিস্তুত ভাই প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন ফরিদপুর জজ্ কোর্টের উকিল। সেই বাড়ীতে অগ্রে গিয়া দেখা না করায় দু-চারিটি কথাও না শুনিতে হইয়াছে এমন নয় (ইহা খুবই স্বাভাবিক!)

রাজা সূর্যকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার উইলে আমাদের চার জনকে 'একজিকিউটরস্' নিযুক্ত করা হয়। (রাজার দুই স্ত্রী, শ্যালক মতিলাল ঘোষ ও আমি।) আমাকে লইয়াই বাধিল গোল—তদানীন্তন ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ জে. এ. উডহেড্ আই-সি-এস (যিনি পরবর্তী কালে অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের পদ অলঙ্কৃত করেন)। তিনি অম্বিকাবাবুকে প্রশ্ন করিলেন "আইন অনুসারে প্রত্যেক এক-

জিকিউটর'কে ৫০ হাজার টাকার জামিন দিতে হয়—হেড্‌মাষ্টারের জামিনের কি হইবে?" অমনি অম্বিকাবাবু উত্তর দিলেন—"হোয়াট! হিস্ অনেস্টি ইজ ওয়ার্থ মোর দ্যান এ ল্যাক্।" সাহেব আর কথা বলিলেন না। ঐ স্টেটে কুমার সৌরীন্দ্রমোহনের নামজারীর সময় রাজার পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ভ্যালুয়েশন' করিতে হইবে। সাহেব আমাকে তিনচার দিন ঐ জন্য ডাকেন এবং আমার সহিত খুব মিষ্ট ব্যবহার করেন। আমি সাহেবকে বলিলাম, "দেখুন সার, স্টেটের আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল নহে—বেশী মূল্য ধরিলে স্টেট্ বহন করিতে পারিবে না।"—সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রাজবাড়ীর ও তৎসংলগ্ন জমি, পুকুর ইত্যাদির মূল্য কত হইতে পারে?" আমি বলিলাম—"ধরুন ২০ হাজার।" সাহেব ঐভাবেই রাজবাড়ী ও কাবিলপুর পরগণার সম্পত্তির মূল্য কম করিয়া ধরিয়া দিলেন (আমি যেরূপ বলিলাম তদ্রূপ)। তাহাতে আমার মনে পড়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল নাম পত্তনের ফি বাবদ। সেই সময় উক্ত সাহেবের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাই। প্রাচীন একটি নবাবের আমলের ক্ষুদ্র জমিদার ঘর—ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। রাজা ত জীবিতকালে রাজবাড়ীতে হাই স্কুল করিয়া দিয়াছেন, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী করিয়া দিয়াছেন, বহু অর্থব্যয়ে পুরীতে 'লেপার অ্যাসাইলাম' করিয়া দিয়াছেন। তিনি ত নিজের ছেলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান নাই। এ স্টেট রক্ষা করা গভর্নমেণ্টের নৈতিক কর্তব্য। এইরূপ মন লইয়া উক্ত সাহেব কাজ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে ফরিদপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসেন মিঃ পোরটার আই-সি-এস। ইঁহারও খুব সুনাম ছিল (পূর্বেই বলিয়াছি ইনি আমাদিগকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন রতনদিয়া স্কুল স্থাপন কালে)

ঐরূপ সুনাম ছিল বরিশালের ডি-এম মিঃ বিটসন বেল ও পাবনার ডি-এম মিঃ লি সাহেবের। এইরূপ হৃদয়বান ম্যাজিস্ট্রেট আজকাল ক'জন দেখিতে পাইবেন?

সাধারণের মধ্যে অসাধারণ

(কালীকুমার দাস)

এঁকে সাধারণ বলি কেন, ইঁহার বিদ্যা থার্ড ক্লাস পর্যন্ত। কিন্তু তিনি কার্যক্ষেত্রে ছিলেন সত্যই অসাধারণ। বাড়ী বানরীপাড়ায়,

বরিশাল জেলায়। রাজবাড়ীতে জলকরের নায়েবী করিতেন। আজ একটা পার্টি হইবে, সব খরচ দিবেন কালী বাবু। আমাদের একটি সংঘ গোছের মিলন ক্ষেত্র ছিল রাজবাড়ীতে। ইনিই ছিলেন তাহার প্রাণস্বরূপ। সংঘ হইতে তাঁহাকে রাজা খেতাব দেওয়া হইয়াছিল।—(আসল রাজাও নহেন, যাত্রাদলের রাজও নহেন, জলকরের রাজা)। তাঁহাকে আমাদের সভায় আসিতে দেখিলেই সকলে সমস্বরে বলিতেন—ঐ আমাদের রাজা আসিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাতে মহাসন্তুষ্ট, বাড়ী বাড়ী মাছ যোগান ছিল তাঁহার প্রায় নিত্যকার অভ্যাস। আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। তিনি যখন রাজবাড়ী আসিয়া বাড়ী করেন—আমিই তখন উক্ত স্থানের জমিদার দাস বাবুদিগকে বলিয়া জমি লইয়া দিয়াছিলাম ও আগ্রহ করিয়া আমাদের পাড়ায় বসাইয়াছিলাম। মাছ যে কত খাওয়াইয়াছেন তাহার অন্ত নাই। আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রীর বিবাহ কালে একদিন ডাকিয়া বলিলেন—"মাষ্টার মশাই, সাবিত্রী দিদির বিবাহ কবে হইবে—তুই এক দিন আগেই আমাকে বলিবেন কিন্তু।" তারপর নির্দিষ্ট দিনের পূর্বদিন গেলেন গোয়ালনন্দ। সেখানে সেদিন খুব বড় মাছ না পাইয়া চলিয়া গেলেন ভারেঙ্গায় (যমুনা নদীর বাঁকে)। সেখান থেকে প্রকাণ্ড দুটি কাতলা মাছ আনিয়া হাজির করিলেন বিবাহের পূর্ব দিন রাত্রে। ওজন হইবে দুটি মাছের প্রায় দেড় মন। বিবাহের দিন দিলেন ২০ হালি (৮০টা) বড় বড় ইলিশ মাছ। কে কত খায়।

জলার দখল লইয়া অন্য জমিদারদের সঙ্গে মামলা। পুলিস হাত করিয়া লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া দাঙ্গা করিয়া লইলেন দখল! একজন দারোগা গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত, ১০ হাজার টাকার জামিন দিতে হইবে—নচেৎ হাজৎ বাস। কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন কালী বাবুর কাছে, তিনি হইলেন জামিন, ইহাকে চেনেন না, জানেন না। ঐ দারোগা হাজিরা না দিলে ১০টি হাজার টাকা কোর্টে দাখিল করিতে হইত। কোন উকিল মোক্তার জামিন হইতে সাহস পান নাই, কালীবাবুর তাহাতে গ্রাহ্য নাই। তাই বলি, ইনি অসাধারণ নহেন কি? একজনের কন্যাদায় উপস্থিত—দিয়া দিলেন ১০০ টাকা। এরূপ দান যে কত ছিল তাহার সংখ্যা নাই। প্রতিবৎসর বরিশাল হইতে মহাজনী নৌকা বোঝাই ধান

আসিত। ৩০০ মন—বড় বড় মটকি (কোলা)-তে সঞ্চিত থাকিত (তখনকার দিনে বরিশাল ছিল—"দি গ্র্যানারী অব্ ক্যালকাটা") উৎকৃষ্ট বালাম, প্রতি বেলায় পাতা পড়িত—৫০ হইলে ১০০ খানা। যত মৎস্যজীবী নানা অভিযোগ লইয়া আসিত, তাহাদিগকে খাইয়া যাইতে হইত—এ ছিল নিয়মের মধ্যে। ইহা ছাড়া অতিথি অভাগত তো ছিলই। একদিন আমাকে তাঁহার চাউলের মটকি দেখাইতে লইয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখি ২৫-৩০ টি মটকি ভর্তি চাউল। দেখিয়া মনে হইল যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মা সরস্বতী তাঁহাকে কৃপা না করিলেও মা লক্ষ্মী তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন—তাহা কয় জনের ভাগ্যে জোটে? ইঁহার দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজবাড়ীতে একজন, নিবারণ চক্রবর্তী, অন্যজন নীরদ সরকার, মোক্তার। এই তিনজনকে আমরা '3 Satellites' বলিতাম। অন্য দু জনের ক্ষমতাও কম ছিল না। কালী বাবুকে নাজেহাল করিতে কম চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু কালীবাবুর মত পয়সার জোর ও লোকবল না থাকায় ইঁহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিতেন না। আবার ইহাও দেখিয়াছি ঐ তিন জন একত্র হইয়া কত হাসি, ঠাট্টা, গল্প গুজবে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

পরিতাপের বিষয়, কালীবাবুর দুটি পুত্র ছিল, দুটিরই অকাল মৃত্যু ঘটে। একটির তাঁহার জীবন কালে, অপরটির তাঁহার মৃত্যুর পর। একটি মাত্র কন্যা ছিল, তাহাকে পূর্বেই বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন রাজবাড়ীর এক উকিলের সঙ্গে।

কালীবাবুকে লইয়া আমাদের সংঘের মেম্বরেরা অনেকে হাসিঠাট্টা করিয়াছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই বলিতেন—"ঐ আমাদের 'রাজা' আসিতেছেন।" আবার চলিয়া গেলেই বলিতেন, "যাই বলুন লোকটি 'বাঙ্গাল' হইলেও হৃদয় আছে।" কিন্তু আমি তাঁহাকে কোন দিন বিদ্রূপ ত করিই নাই বরং অন্তরে শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার মহৎ গুণের জন্য তিনি ছিলেন পরোপকারী ও বিপন্নের বন্ধু।

কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ইঁহার বাড়ী ছিল যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার নান্দোল গ্রামে। ইঁহার সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার না থাকিলেও চিকিৎসক হিসাবে ইনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে আসিয়া ওঠেন লক্ষ্মী-

কোল রাজা সূর্যকুমার গুহরায় মহাশয়ের বাড়ীতে। রাজা তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার দ্বারা 'মদনানন্দ মোদক,' 'বসন্ত কুসুমাকর রস' প্রভৃতি মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া লন। অল্প দিন মধ্যেই কবিরাজ মহাশয়ের পসার প্রতিপত্তি জমিয়া ওঠে।

ইনি ছিলেন খুব আমোদ প্রিয়। মাঝে মাঝেই আমার রতনদিয়ার বাড়ীতে আসিতেন এবং রতনদিয়ার ছেলেরা যখন দেখিল ইহার মস্তিষ্কের একটি 'স্ক্রু' ঢিলা—তখন তাহারা ইঁহাকে পাইয়া বসিল। গানের নেশা ছিল অতি প্রবল, যদিও গলা মোটেই মিষ্ট ছিল না। একদিন আমার রাজবাড়ী বাড়ীতে কবিরাজ 'বাগেশ্রী' আলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন "কে রচিবে মধু চক্র-মধুকর মধূ-উ-উ বিনে"। আমি বলিলাম "ছাই হচ্ছে।" আর যায় কোথা! "কি আমি 'বাগেশ্রী' আলাপ করিতে জানিনা। একথা যে বলে সে···"বলিয়া আমাকে গালি দিয়া বসিলেন। এদিকে রাজবাড়ী আসিবার পর থেকেই আমাকে 'গুরুদেবের' সম্মান দিতেন। আমি কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলাম এবং কিছু আহার না করিয়াই স্কুলে চলিয়া গেলাম। কবিরাজ যখন শুনিলেন আমি না খাইয়া স্কুলে গেছি, তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনাহারে থাকিলেন। আসল কথা আমার সেদিন পেটের অবস্থা ভাল ছিল না। সোডি বাইকার্ব খাইয়া স্কুলে চলিয়া গিয়াছিলাম। কবিরাজ ভাবিয়াছেন আমি তাঁহার উপর রাগ করিয়াছি। আমি ৪টায় ফিরিয়া আহার করিলাম, শেষে করিবাজ-কেও ধরিয়া খাওয়াইলাম। করিরাজ বলিলেন "আমি গুরুদেবকে অপমান করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি?" আমি উত্তর করিলাম "বাগেশ্রী রাগিণীটা ভাল করিয়া শেখা।"

তারপর রতনদিয়া আসিয়াছেন আমার মেজদার দ্বিতীয়বার বিবাহ উপলক্ষে। বাড়ী লোকে পূর্ণ। ঐ সময়ে আমি প্রস্তাব করিলাম আজ আর গান নয় বক্তৃতা। বিবাহ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা মাত্র কবিরাজ দাঁড়াইয়া গেলেন। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক—শুনিয়াছি ইনি বক্তা ভাল।" কয়েকবার কাসিয়া লইয়া কবিরাজ স্বরু করিলেন—

"বিবাহ শব্দের অর্থ কি? 'বি' পূর্বক 'বহ' ধাতু হইতে 'বিবাহ' শব্দের উৎপত্তি—অর্থাৎ কিনা—যাহাকে বিশেষ ভাবে বহন করিতে হইবে।"

(শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল, না না কবরেজ মশাই ওটা বোধ হয় দোহন হইবে।) চুপ চুপ। 'বিবাহ' শব্দের মানে হইল 'উদ্বাহ' (উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া নৃত্য নহে কি!) কবিরাজ—"আ, আপনারা বড় গোল করিতেছেন।" চুপ চুপ ধ্বনি। "অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া নারায়ণ শিলা সাক্ষ্য করিয়া (হিয়ার, হিয়ার ধ্বনি) ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য করিয়া দুইটি হস্ত একত্র করিয়ে দেওয়া।" (আচ্ছা, কবরেজ মশাই—এরা দুইজনেই পুরুষ, না দুইজনেই স্ত্রী লোক ?)—"কি এতবড় কথা!" কবিরাজ চুপ। (না, না আপনি বলুন—) "ভগবানের এই যে সৃষ্টি ইহার মূলে হইল বিবাহ।" (তা না হইলে আর কবিরাজ মশাইকে পাইতাম কোথায়, আর এ সৃষ্টি রহস্যই বা শুনিতাম কার কাছে ?) এই সময় কয়জনে মিলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে শোয়াইয়া দিল এবং তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ হইল। 'আনো পাখা আনো জল'। জল আসিল ও পাখা আসিল। মাথায় জল ঢালা হইল, বাতাস চলিল। কবিরাজ ভীষণ চটিয়া গেছেন। বলিলেন—"আমি এখুনি রতনদিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।" আমি বলিলাম "সত্যই ত' বক্তৃতাটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় সব মাটি করিয়া দিল। তোমরা অতি বদ।" আর অমনি কবিরাজের রাগ পড়িয়া গেল। বলিলেন "সত্যই কি বক্তৃতা ভাল হইতেছিল ?" আমি বলিলাম "আপনি যে কয়টি কথা বলিতে পারিয়াছেন তা অতি দামী কথা।" সকলেই সায় দিলেন। তখন চা ইত্যাদি আসিয়া হাজির করা হইল।—'রাম অতি সুবোধ বালক'—এইরূপ স্বভাব, রাগিলেও বেশীক্ষণ রাগ থাকে না। কবিরাজ থাকিয়া গেলেন বেশ কিছু দিন।

ইহার অনেক দিন পর। কবিরাজ রাজবাড়ীতে নাই। আমি একটু চিন্তিত হইয়াই পড়িয়াছিলাম তাঁর জন্য। হঠাৎ একদিন ঢাকা মেলে রাজবাড়ী নামিয়া 'সস্ত্রীক' আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন "সানাই বাজাইয়া আনিলাম ৮ বছরের বউ।" বয়স অবশ্য সত্যই ৮বৎসর ছিল না, ১৪।১৫ হইবে। অমনি পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সব হাজির। লাগিয়া গেল উৎসব, উলু ধ্বনি, শাঁখ বাজান ইত্যাদি। সে রাত্রে আর কাহারও চোখে ঘুম নাই। লৌকিক আচার, মেয়েরা যে যাহা বলিয়া গেলেন বিনা প্রতিবাদে কবিরাজ তাহা করিয়া গেলেন। এক দিন রাজবাড়ী থাকিলেন। আমি বরকনেকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলাম "এখন আপনি সংসারী হইলেন, দেশে যান সংসার ধর্মে মন দিন। ভগবান আপনার

মঙ্গল বিধান করিবেন।" কবিরাজ দেশে চলিয়া গেলেন আর রাজবাড়ী ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার স্মৃতি সর্বদাই মনে পড়ে ও মন বেদনায় ভরিয়া যায়। কবিরাজের প্রতিভা ছিল সত্যই কিন্তু একটি মাত্র দোষে তাহা বিকাশ পাইতে পারিল না। আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ প্রণালী তাঁর মত আজ কয়জন জানেন?

আমাদের সংঘ

মিলন কেন্দ্র

আজকাল যেমন 'চৈতালী' 'মিতালী', 'স্মরণি', 'বলাকা' 'টাইগার ক্লাব', 'উদয়ন'—প্রভৃতি সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, তখনকার দিনে এ জাতীয় কিছু ছিল না। ছিল 'অনুশীলন সমিতি', 'শক্তি সমিতি'—এইরূপ দুইচারিটি মাত্র। আমাদের সমিতির কোন অপিস বা নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কোনও দিন রাজবাড়ী রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে, কোনও দিন আমার বাড়ীতে। তবে অক্ষয়কুমার দে (যাঁহাকে সকলেই 'অক্ষয়দা' বলিয়া ডাকিতাম, ইনি ছিলেন ই. বি. রেলওয়ের ড্রাফটসম্যান) মহাশয়ের বাসাতে প্রায়ই আড্ডা বসিত। ঐ বাড়ীতে স্বামী স্ত্রী দুজন মাত্র থাকিতেন। সন্তানাদি হয় নাই, বাড়ী ছিল কলিকাতায়। অতি অমায়িক ও বন্ধু-বৎসল ছিলেন এই অক্ষয় বাবু। আমরা আসামাত্র চায়ের জল বসিত স্টোভে, তৈয়ারী হইলেই ভিতর হইতে আমাদের (সকলের) বৌদি চামচ দিয়া প্লেটে 'ঠং' শব্দ করিতেন, অক্ষয়বাবু ছুটিয়া গিয়া চা আনিয়া হাজির করিতেন। তারপর আরম্ভ হইত নানা প্রসঙ্গ। কালীবাবু (কালীকুমার দাস জলকর নায়েব)-কে আসিতে দেখিলেই অক্ষয়বাবু চেঁচাইয়া উঠিতেন "ঐ আমাদের 'রাজা' আসিতেছেন।" কালীবাবু তাহাতেই মহাখুসী। ইনি বাড়ী বাড়ী মাছ যোগাইতেন বলিয়া সকলেই ইঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন এবং পরোক্ষে ইঁহাকে 'বাঙ্গাল' বলিয়াও কেহ কেহ টিটকারী দিতেন।

সমিতির মেম্বার ছিলেন :—

(১) ব্রজবন্ধু ভৌমিক—প্রথমে সব-ডিঃ কলেকটর পরে এস-ডি-ও গোয়ালনন্দ

(২) জিতেন্দ্রনাথ মিত্র—এনজিনিয়ার, পরে এস্-ডি-ও

(৩) যোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—সব-এনজিনিয়ার।

(৪) কালী বন্দ্যোপাধ্যায়—সুপারভাইজিং স্টেশন মাস্টার
(৫) ললিত গাঙ্গুলী—'পে' ক্লার্ক
(৬) কুমুদিনী গাঙ্গুলী—হেডমাষ্টার, গোয়ালনন্দ হাইস্কুল।
(৭) বিপিন গাঙ্গুলী—রেলওয়ে ড্রাফটস্‌ম্যান
(৮) যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য—অ্যাসিস্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার আর. এস.কে. ইনস্টিঃ
(৯) কালীকুমার দাস—নায়েব, জল্‌কর।
(১০) প্রবোধ মজুমদার—(ইনস্পেকটর অব পুলিস)
(১১) চন্দ্রবাবু—(ডুগী, তবলা, হারমোনিয়মের সুদক্ষ বাজিয়ে)
(১২) অক্ষয়কুমার দে (রেল-ড্রাফটস্‌ম্যান)
—(এই ১২ জন আমি ছাড়া)

সংঘের মেম্বারদের কাজ ছিল—প্রধানতঃ অবসর বিনোদন জন্য সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হওয়া, আনন্দ করা ও জন-সেবা যতটা করা সম্ভব। এক বাড়ীতে ১০ বৎসরের এক পাত্রীর সঙ্গে ৬০ বৎসরের একজনের বিবাহ হইবে জানিতে পারিয়া খবর দিলাম প্রবোধবাবু পুলিস-ইনস্পেকটরকে। দিলাম বিবাহ পণ্ড করিয়া। তারপর আমরা চাঁদা তুলিয়া দুঃস্থ পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিলাম—কোন বাড়ীতে মৃতের দাহ হইতেছে না, করা গেল তার ব্যবস্থা। এইরূপ রোগীর চিকিৎসা, ছাত্রদিগকে সাহায্যদান, সমাজসেবা কিছু কিছু।—দুই কবিরাজের মধ্যে "টাগ অব ওয়ার"-এ এইরূপ আনন্দের খোরাকও মাঝে মাঝে জুটিয়া যাইত।

স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, স্থানে স্থানে সভা হইতেছে, বড় বড় বক্তা অম্বিকা মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেছেন, অম্বিকাবাবু বলিলেন—"রাজবাড়ী হইতেছে ঈশ্বর পরিত্যক্তস্থান। বিপিনচন্দ্র পাল হুঙ্কার দিতেছেন 'পর্বতের এক কন্দর হইতে ধ্বনি উঠিবে 'বন্দে মাতরম্' অন্য কন্দর হইতে প্রতিধ্বনি উঠিবে 'বন্দে মাতরম্'—ইত্যাদিতে সভা সরগরম! প্রায় ৮।১০ হাজার লোকের সমাবেশ। অম্বিকাবাবু সেদিন আমার বাসাতেই আহার করেন ও আমার উক্ত সভায় যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও যাইতে হইল অম্বিকাবাবুর আহ্বানে। না গেলে চটিয়া যাইবেন ভয়ে তিনি আমাকে দিয়া 'রেজোলিউসন' 'মুভ' করাইয়া লইলেন (আমি তখন অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট) আমি মন্ত্র পড়ার মত রেজোলিউসনটি পড়িয়া গেলাম (ইহার পরিণাম জানিয়াও)। তার কিছুদিন পর আসিলেন কয়েকজন সি. আই. ডি.

অফিসার; কালীবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহারা বসিয়াছেন—আমাকে ডাকাইলেন, গেলাম। গিয়া দেখি তাঁহাদের মধ্যে আমার প্রাক্তন ছাত্র সুরেশ মিত্র সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর! তিনি উঠিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। গেলাম বাঁচিয়া। কোন ফ্যাসাদে পড়ি নাই।

পূর্বে বলিয়াছি—মাঝে মাঝে আমার বাসায় 'সংঘের' সভা বসিত। একা রবিবার আমি গিয়াছি রাজার বাড়ী উইলের 'একজিকিউটর' হিসাবে কাজকর্ম দেখিতে। ৯টা আন্দাজ বাসায় ফিরিয়া দেখি—সভ্যেরা কয়েকজন আগেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন আমার বসিবার ঘরে এবং তাস খেলিতেছেন। আমি আসামাত্র কুমুদিনী বাবু হাঁকিলেন—"এ বাড়ী আপনার নয়—আমি হেডমাষ্টার এ আমার বাড়ী, আপনি বেরিয়ে যান।"—আমি উত্তর দিলাম—"জামা কাপড় ছাড়িয়া আসি, তারপর দেখাইতেছি কে কাহাকে বাহির করে।" বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখি লুচি ভাজা হইতেছে। আমি হেমন্ত দপ্তরীকে ডাকিয়া বলিলাম—"যাও তো, দুই টাকার রসগোল্লা কিনিয়া আনো।" রসগোল্লা তখন টাকায় দুই সের—১৬টায় সের।—ব্রজবন্ধু বাবু (তখন সব-ডিপুটি) বলিলেন,—"দেখুন এসব করিলে আপনার বাড়ী আর আসা হইবে না।" তারপর যখন হেমন্তকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, টাকা দুটো নষ্ট করিও না, কিছু কাঁচাগোল্লাও আনিয়ো—বুঝিলে!" এইভাবে আমরা আনন্দ করিয়া গিয়াছি—সেদিন কি আর ফিরিয়া আসিবে?

প্রবোধ বাবু (পুলিস ইন্সপেক্টর) ঐদিন আমাকে বলিলেন "ত্রৈলোক্য বাবু, রাজাকে বলিয়া আমাকে 'পোষ্যপুত্র' লইতে বলুন না, পুলিসের চাকরিতে ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে।" আমি বলিলাম, "আমি ব্রাহ্মণ বলিয়াই বাধিয়াছে গোল, তা না হইলে ত আমাকেই 'পোষ্য' লইতেন। আমি ত পোষ্য আছিই, আপনাকে লইবেন কেন?"

আমাদের সংঘে একজন মুসলমান সভ্যও ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। নাম কাজি আজিজুল হক হইবে মনে হয়, তাঁহাকে 'মুরগী' বলিয়াই অনেকে ডাকিতেন কিন্তু ভদ্রলোক তাহাতে কিছু মনে করিতেন না। এতই মিষ্ট ছিল তাঁহার স্বভাব, তিনি রাজবাড়ীর সব-রেজিষ্টার ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল মাছবাড়ী, রতনদিয়া হইতে মাত্র ২ মাইল দূরে।

একটি বিয়ে পণ্ড

আমি একদিন প্রবোধ মজুমদার (ইনস্‌পেক্টর অব পুলিস রাজবাড়ী থানা) মহাশয়কে খবর দিলাম—"দুই জন কনস্টেবল সহ অদ্য সন্ধ্যায় আসুন ৯ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৪৫ বৎসরের একটি লোকের বিবাহ হইবে আমাদের পাড়ায়—ঐ বিবাহ ভাঙ্গিতে হইবে।

ঘটনাটি সংক্ষেপতঃ এই : পাবনা জেলায় সাগরকাঁদি গ্রামে একটি কায়স্থ বাস করিত। তাহার কোন আয়ের পথ ছিল না। যখন দুর্দশার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিল তখন ঘরের একটি করিয়া শাল খুঁটি বিক্রয় করিয়া একটি করিয়া বাঁশের খুঁটি লাগাইত। যখন সব গুলি কাঠের খুঁটি বিক্রয় হইয়া গেল, একদিন ঝড়ে ঘর খানি পড়িয়া গেল। ঐ কায়স্থ লোকটি চলিয়া আসিল পদ্মা পার হইয়া রাজবাড়ীর নিকট এক আখড়ায়, উদ্দেশ্য স্বামী স্ত্রী 'ভেক' লইবে ও বোষ্টম হইয়া ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিবে। ঐ সংবাদ পাইয়া সাধন দাস নামে ৪৫-৫০ বয়স্ক একজন লোক ঐ ৯ বৎসরের মেয়েটিকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ী লইয়া যায় ও তাহাদের পরিবারটিকে আশ্রয় দেয়। আমি একদিন সাধন দাসের বাড়ী গিয়া শুনিলাম সেই রাত্রেই ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইবে, গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, ঢুলী ঢোল বাজাইতেছে, ঐ বিবাহের 'ঘটকি' বুড়ো ঝি (এই বুড়ী আমাদের পাড়ায় থাকিত এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ঝি আমদানী করিয়া বাসায় বাসায় কাজে লাগাইয়া দিত) তাহাকে বলিলাম "এ সব কি হইতেছে?" ঝি বলিল, "না বাবা, আপনি বাধা দিবেন না—আমি সাধনকে সাত পাক ঘুরাইয়া বিবাহ দিয়া দি।" আমি বলিলাম—"বেশ ত। বয়স্থা মেয়ের কি অভাব আছে? আমরাই পাত্রী দেখিয়া দিতেছি।" সে বলিল, "না বাবা, সব ঠিক হইয়া গেছে—শুধু বিবাহ দেওয়া বাকী।" আমি বলিলাম—"দেখ বুড়ী, তুমি যদি সাধনকে পাত্রী দিয়া ৭ পাক ঘুরাও—আমি তোমাকে ৪৯ পাক ঘুরাইব বলিয়া রাখিলাম।"

তবু ঐ রাত্রেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রবোধদা (ইনস্পেক্টর অব পুলিস্) দুই জন কনস্টেবল সহ উপস্থিত। তাঁকে নিয়া গেলাম বিবাহ বাড়ী। পুলিস দেখিয়া সাধন দাস গাড়ু হাতে মাঠের দিকে চম্পট দিল। পুলিস ঐ মেয়েটির মাকে দেখিয়া বলিল,—"কেন তোরা পদ্মা নদী পার হইয়া আসিলি—গলায় কলসী বাঁধিয়া মেয়েটাকে জলে ডুবাইয়া দিস নাই

কেন ? চল সকলে থানায়।" মেয়ে, মা, বাবা, সাধন দাস (পাত্র) সবাইকে একবারে হাজির করা হইল। এই চার জনকে থানায় লইয়া যাওয়া স্থির হওয়ায় আমি বলিলাম, "এই বুড়ীই সকল অনর্থের মূল, ইহাকে থানায় দিতেই হইবে।" তাহাকে সমেত পাঁচ জনের সারা রাত্রি থানায় বাস। পরের দিন প্রাতে 'মুচলেকা' লিখিয়া নেওয়ার পর ছাড়া পাইল। আমরা সংঘ হইতে প্রত্যেকে দুই এক টাকা করিয়া দিয়া তাহাদের খরচ চালাইতে লাগিলাম। এক কায়স্থ ভদ্রলোক (বাড়ী চরনারায়ণপুরে) ঐ পরিবারটিকে আশ্রয় দিলেন। আমরা দশ পনেরো টাকা করিয়া মাস মাস সাহায্য দিতে লাগিলাম। পরে ঐ মেয়েটির দাদা আসিয়া তাহাদের লইয়া যায়। পরে শুনিয়াছিলাম মেয়েটি পাত্রস্থা হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীজগন্নাথ" বেশে মতিলাল ঘোষদস্তিদার

ইনি হইতেছেন বরিশাল জেলার গাভা গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ-দস্তিদার বংশের সন্তান ও রাজবাড়ী-লক্ষ্মীকোলের জমিদার রাজা সূর্যকুমার গুহরায়ের শ্যালক। মতিলাল ও আমি সমবয়স্ক ছিলাম এবং আমি যখন লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীতে স্থান পাইলাম, উভয়ে একস্থানে বসিয়া খাইতাম, এক শয্যায় শয়ন করিতাম, এক সঙ্গে বেড়াইতাম। আমাদের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে। মতিলাল পড়িত আমার এক শ্রেণী নীচে। সে পড়াশুনায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমি যখন কলিকাতা চলিয়া আসিলাম পরীক্ষা পাস করিয়া, মতিলাল রাজবাড়ীতেই পড়িতে থাকে এবং রাজা যখন কলিকাতাবাসী হইলেন, মতিলাল কিছু দিন মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দেয়। বলে, আমার পড়াশুনা হইবে না। তার কয়েক বৎসর পর রাজার মৃত্যু হইল ভুবনেশ্বরে। তিনি উইল করিয়াছিলেন পূর্বেই—তাহাতে রাজার দুই স্ত্রী, শ্যালক মতিলাল, ও আমাকে উইলের একজিকিউটর করিয়া যান। আমি তখন সারা মাড়োয়ারী স্কুলে হেডমাষ্টারের কাজ করিতেছিলাম। আমার স্কন্ধে ঝুঁকি আসিয়া পড়ায় বিব্রত হইয়া পড়িলাম —মতিলালই স্টেটের কাজ কর্ম দেখেন, আমি মাঝে মাঝে রাজবাড়ী আসিয়া গুরুতর বিষয়ে উপদেশ দিই। এইভাবে কাজ কর্ম চলিতে লাগিল।

একদিন শুনিলাম মতিলাল রাজার লাইব্রেরীটি রাজবাড়ী উডহেড লাইব্রেরীকে দান করিয়া বসিয়াছেন আলমিরা বুক কেস সহ, এবং এস-

ডি-ও মিস্টার আর, এম, দাসকে কথা পর্যন্ত দিয়া ফেলিয়াছেন। আমি সারা থেকে ছুটিয়া আসিয়া এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম "ঐ লাইব্রেরীটি রাণীদের—তাঁহারা বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন উহার পিছনে—উহা দান করিলে তাঁহারা ব্যথা পাইবেন, তাঁহারা এখনও জীবিত, তা ছাড়া আমরা স্টেটের 'একজিকিউটর' মাত্র—স্টেটের বা অন্যের সম্পত্তি দান করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না।" আমার উপর সাহেবের ভাল ধারণা পূর্ব হইতেই ছিল—তিনি বলিলেন, "আচ্ছা!" মতিকে বলিলাম—"এ কি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি যে দান করিয়া বসিয়াছিলে?"

ইহার কিছু দিন পর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম—মতিলাল কাবিলপুর পরগনা পরিদর্শনে গিয়া সেখানে 'স্বয়ং জগন্নাথ' বেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি কিছু দিন ধরিয়া পূজা অর্চনায় খুব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিছু পরিমাণ 'ভাঙ্গ' রোজ ব্যবহার করিতেন, মাত্রা বাড়িয়া দেওয়ার ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। কলিকাতা থেকে দুই খানি গরদ অনেক টাকা দিয়া খরিদ করিয়া আনাইলেন। এক খানি 'বলরাম'-এর জন্য—আর একখানি নিজের (স্বয়ং জগন্নাথ) জন্য। আসনে বসিয়া মন্ত্র পড়িয়া নিজেকেই পূজো করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া ঐ পরগনার ম্যানেজার বাবু তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া লক্ষ্মীকোলে রাখিয়া যান।

লক্ষ্মীকোল আসিয়াও পূজা অর্চনা সমান ভাবে চলিতে লাগিল এবং প্রকাণ্ড এক বহি বাঁধিয়া তাহাতে লিখিতে লাগিলেন—রা-রা-রা রারা—লাইনের শেষে 'রা' বর্ণটি দিয়া—যথা—

"যত সব চোরা-রা—
পিলু তপন ভাবিস না-রা—"

আমি গেলেই পড়িয়া শোনাইতেন—"এই দেখ কি লিখিয়াছি!" আমি বলিতাম—"এ একখানি চমৎকার গ্রন্থ হইবে।" মুখে বলিলাম বটে, তবে বুঝিলাম আর আমার এখন চুপ করিয়া থাকা চলে না। ছুটিয়া গেলাম ফরিদপুরের ডি-এম (মিঃ জে. এ. উডহেড, আই-সি-এস) ও অম্বিকাচরণ মজুমদার (এম-এ, বি-এল্) উকিল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে। তাঁহাদের দুই জনকে মতিলালের অবস্থা খুলিয়া বলিলাম এবং সৌরীন্দ্রমোহনের হস্তে স্টেট বুঝাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলাম। সৌরীন্দ্রের

তখন 'সাবালক' হইতে ১ বৎসর বাকি ছিল। ডি-এম সম্মত হইলে এই মত ব্যবস্থা করিয়া আমি খালাস পাইলাম। সৌরীন্দ্র তখন সারা স্কুলে ১ম শ্রেণীতে পড়িতে ছিল।

দুঃখের বিষয়—মতিলালকে কিছু দিন পর রাজবাড়ী হইতে একরকম বল প্রয়োগ করিয়াই বরিশালে নেওয়া হয়। তিনি সেখানে ঐ জেলারই একাংশে (নৈহাটী) খড়ের ঘর করিয়া বাস করিতে থাকেন, খুব কষ্টের মধ্য দিয়াই দিনপাত হইতে থাকে। ঐ সময় মতিলাল প্রকৃতিস্থ হন এবং রাজবাড়ীর এক উকিলের বাসায় আসিয়া ওঠেন। রাজার উইলে সর্ত ছিল রাজার জীবনান্তে মতিলাল ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণ (সাবালক না হওয়া পর্যন্ত) মাসোহারা পাইবেন—এইবার মতিলাল কুমারের বিরুদ্ধে মোকর্দমা দায়ের করিলেন। তখন আমরা কয়েক জন পড়িয়া যাহাতে মোকর্দমা তুলিয়া লন, সেই ব্যবস্থা ও মতিলালকে এক যোগে ১০ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলাম। মতিলাল দেশে চলিয়া গেলেন। ছেলেগুলি সবই নাবালক—বড় ছেলে পিনু (বিমলাপ্রসাদ) অনারস্ সহ বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে। সংবাদ আসে সে অনার্স সহ বি-এ পাস করিয়াছে। কিন্তু দৈবের লিখন কে খণ্ডাইবে? যখন পরীক্ষা পাসের সংবাদ আসিল, বিমল তাহার এক দিন পূর্বে সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। মতিলালের মৃত্যু পূর্বেই হইয়া ছিল। দ্বিতীয় পুত্র তপন-কুমার (অধুনা খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার) তখন শিক্ষালাভার্থ বিদেশে স্কুলে পড়ে।

মতিলালকে আমি 'মামু' বলিয়া ডাকিতাম এবং তাঁহার স্ত্রী আমাকে 'ভাগনে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্কুলে তখন দালান হয় নাই, প্রকাণ্ড টীন সেড্ পাকা 'প্লিনথ' মুলী বাঁশের বেড়া, জানালাগুলি পড়িয়া গিয়াছে, আমি একটি ছেলেকে ডাকিয়া আমরা দুই জনে ঐ জানালা ঝুলাইয়া তুলিয়া দিতেছি (তা না হইলে 'জন' ডাকিতে হইবে, সে ঐ সামান্য কাজের জন্য দুই টাকা চাহিয়া বসিবে) এমন সময় মতিলাল আসিয়াছেন স্কুলে এবং আমাকে জানালা বাঁধিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ত্রৈলোক্য তুমি নাকি মাঝে মাঝে অন্যত্র চলিয়া যাইতে চাও? তুমি চলিয়া গেলে জানালা বাঁধিতে কোন হেডমাষ্টার আসিবেন?" আমি উত্তর করিলাম "It is a part and parcel of my body" এবং আমি যতদিন আছি আমার দেহের অঙ্গহানি দেখিতে কষ্ট হয়। পরে অবশ্য ঐ ঘর

পড়িয়া যাওয়ায় ঐ স্থানে চারিটি বড় দুই রুম বিশিষ্ট একটি পাকা দালান দেওয়া হয় (ইহা রাজার জীবিত কালেই হয়)। তাঁহার মৃত্যুর পর আরও একবার দালানটি কি ভাবে আমরা গড়িয়া তুলি তাহার বিবরণ পূর্বেই দিয়াছি।

রাজবাড়ীর দুই কবিরাজের মধ্যে টাগ অব ওয়ার

গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত

বনাম

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

আমি যখন রাজবাড়ী স্কুলে শিক্ষকতা করি, বরিশাল জেলার গৈলা গ্রাম হইতে আসিলেন গোপালচন্দ্র দাসগুপ্ত কবিরাজী করিবার উদ্দেশ্য লইয়া। ছিলমপুরের দাস জমিদার বাবুদের সহিত আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, গোপালের জন্য জমি লইয়া দিলাম। বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, তবে আয়ুর্বেদীয় ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী ভালই আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ব্যবহারেও ছিলেন খুব অমায়িক, তজ্জন্য ২।৪ বৎসর মধ্যেই বেশ পসার জমিয়া উঠিল। তাহার ৪।৫ বৎসর পর আসিলেন ঢাকা জেলা হইতে আর একজন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ইনি ঢাকায় কোন নর্মাল ত্রৈবার্ষিক স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করিতেন পরে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কবিরাজী আরম্ভ করেন। ইনি যখন আসিলেন তখন গোপাল কবিরাজের খুব নাম। তিনি কয়েকটি ধনী মহাজন ঘর (ভাজন ও পোদ্দার) হাত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছ হইতে বেশ কিছু আয় করিতেন। কিছু দিন পর যোগীন যান পালকিতে রোগী দেখিতে। গোপালের পালকি ত ছিলই—'ঘোড়া রোগে ধরিল তাঁকে' কিনিলেন ঘোড়া, রাখিলেন সহিস, ২।৩ জন কমপাউণ্ডার, ঝি চাকরে বাড়ী জম জমাট।

এদিকে, যোগীন্দ্র কবিরাজও পসার জমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি একে শিক্ষিত, প্রকৃতি স্থির, গম্ভীর, বাচালতা মাত্র নাই। তিনি ছিলেন তদুপরি ফরিদপুরের 'প্রভু জগদ্‌বন্ধুর' প্রধান শিষ্য। তখন ফরিদপুর জেলায় প্রতিটি পল্লী "জয় জগদ্‌বন্ধু বল হরি বল হরি বল—হরি পুরুষ জগদ্‌বন্ধু মহা উদ্ধারণে—" সঙ্গীতে মুখরিত। যোগীন্দ্র কবিরাজেরও নাম ডাক অল্প দিন মধ্যেই হইয়া গেল। দুই কবিরাজ রীতিমত পাল্লা দিয়া চলিতে লাগিল।

আমাদের সংঘের কালীকুমার দাস (জলকর নায়েব) গোপালের প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না, যদিও দুইজনেরই বরিশাল জেলায় বাড়ী। আমাদের সভা বসিয়াছে, কালীবাবু বলিয়া বসিলেন—"আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনি গোপালের কাছে হইতে ১০ টাকা আনিয়া দিতে পারেন সংঘের নাম করিয়া ?" আমি উত্তর দিলাম—"১০ টাকা কেন ৫০ টাকা আনিতে পারি। তবে সংঘের নামে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইব কেন ? টাকা আনিব তাঁহাকে কায়দায় ফেলিয়া। আপনারা বসুন এই আনিতেছি।" এই বলিয়া আমি চলিয়া গেলাম গোপালের কাছে ও গিয়া বেশ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "কবিরাজ, যোগেন কবিরাজের ত ইনকাম ট্যাক্স হইয়া গেল।" তিনি বলিলেন "তার মানে ?" আমি বলিলাম "কার কিরূপ আয় তাহার উপরেই ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয়। তাঁর ট্যাক্স ধরা হইল—তোমার হইল না—এতে প্রমাণ হইতেছে যে তোমার চাইতে যোগীন কবিরাজের আয় বেশী। বিষয়টি রোগীমহলে জানাজানি হইয়া গেলে তোমার পক্ষে কিছু অসুবিধার কথা।" কবিরাজ শুনিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন "যান মাষ্টার মশাই, এখনই ব্যবস্থা করুন যাহাতে আমার ট্যাক্স অন্ততঃ ৫ টাকা বেশী হয়।" আমি বলিলাম, "দাও কিছু, যারা ট্যাক্স বসায় তাদের হাতে কিছু গুঁজিয়া না দিলে কথাই বলিবে না।" তিনি বলিলেন "কত দেবো ?" বলিলাম "এখন ১০ টাকা দাও পরে বেশী চায় দেওয়া যাইবে।" কবিরাজ অমনই ১০ টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন "দেখিবেন একাজ যাতে হয়—টাকার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি ছাড়া আমাকে বিপদে সাহায্য করিবার আর কে আছে এখানে ?" আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখি সবাই বসিয়া আছেন আমার অপেক্ষায়—দিলাম কালীবাবুর হাতে ১০ টাকা। বলিলাম "দেখিলেন ত ?"

তার ক'দিন পর গোপালকে টাকা ফেরত দিয়া বলিলাম "তুমি এই বিদ্যা লইয়া কবিরাজী কর ? ইনকাম ট্যাক্স কি কেউ সাধিয়া দেয় বরং কাটিবার চেষ্টা করে। নচেৎ উহা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। যোগীন কবিরাজকে ধরিয়াছিল তিনি অনেক 'ধরোয়া' করিয়া রেহাই পাইয়াছেন।" কবিরাজ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ঐ টাকা আমি ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি; ফিরিয়া লইব না। আপনারা ঐ টাকার

সদ্ব্যবহার করুন গে।" তাই করা হইয়াছিল। গোপালের ক্ষতি যে মাত্র ১০ টাকার উপর দিয়াই গেল তাহাতেই কালীবাবুর আনন্দ!

সারা দিনের পরিশ্রমের পর প্রতিসন্ধ্যায় ও ছুটির দিনে এইভাবে করিতাম আমরা অবসর বিনোদন ও আনন্দ! কাহারও কোন দুর্বলতা পাইলে আমরা লাগিয়া যাইতাম তাহার পিছনে, যেমনটি গোপাল কবিরাজ ও রমেশ কবিরাজের ক্ষেত্রে করা হইয়াছিল। "দীনু চাটুজ্যের বিবাহ" ও তাঁহার "মহিমসাহী পরগণার জমিদার হওয়া" র কাহিনী কম আনন্দের খোরাক যোগায় নাই।

রাজবাড়ী সংঘের আর একটি কীর্তি আজিও মনে পড়ে। তখন অন্নদা গুপ্ত ছিলেন রাজবাড়ীর এস-ডি-ও এবং ব্রজবন্ধু বাবু সেকেণ্ড অফিসার। মতিরায়ের যাত্রার দল যাইতেছে ময়মনসিংহের কোন জমিদার বাড়ী পালা শেষ করিয়া খুলনায়, ব্রজবন্ধু বাবু (সুপারভাইজিং স্টেশন মাষ্টার), কালীবাবু (জলকর নায়েব) স্থির করিলেন ঐ দলকে রাজবাড়ীতে এক পালা গান গাওয়াইতে হইবে। যে কথা, সেই কাজ। অমনি ছুটিয়া গেলেন কয়েকজন গোয়ালনন্দ ঘাটে, দলের ম্যানেজারকে অনুরোধ করা হইল। তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। তখন গাড়ী রাজবাড়ী আসা মাত্র মালপত্র (৪০। ৫০ টি বাক্স) সব প্ল্যাটফরমে নামাইয়া ফেলা হইল এবং ম্যানেজারের নামে এক 'ওয়ারেণ্ট' বাহির করা হইল (কি অপরাধে মনে পড়িতেছে না) পার্টিকে ডিটেইন্‌ড হইতেই হইল। গানও গাহিতেই হইল। তবে রেলওয়ে হইতে পরে পার্টিকে খুব সাহায্য করা হইয়াছিল খুলনা-যাত্রা কালে।

ভাগ্যবানের বোঝা

'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' গীতা-৯। ২২।

একজন প্রৌঢ় মৎস্যজীবী মালোর হঠাৎ কিভাবে ভাগ্য পরিবর্তন হয় ও তিনি ধনী হইয়া ওঠেন তাহারই বর্ণনা দিতেছি। ইঁহার বাড়ী ছিল গোয়ালনন্দ মহকুমার অন্তর্গত খোকসা ও পাংশা ই-বি রেলওয়ের দুই ষ্টেশনের মধ্যে মাছপাড়া গ্রামে। ইনি এক দিন শয্যাত্যাগ করিয়া মাঠের দিকে যাইতেছিলেন গাড়ু হাতে। একটি পুরাতন পুষ্করিণীর চালা দিয়া রাস্তা। ঠিক ঐ সময় লক্ষ্মীঠাকুরাণী জল হইতে উঠিয়া একটি কাঁসার ঘটি মালোর হাতে দিয়া বলিলেন "আমাকে একটু দুধ আনিয়া দাও

ত।" মালো ঘটি হস্তে ছুটিলেন গ্রামের ভিতরে। অত ভোরে কোন বাড়ীতেই গাই দোহান হয় নাই, তবুও অনেক চেষ্টা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন লক্ষ্মীঠাকুরাণী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। কি কান্না মালোর! দুধ সুদ্ধ ঘটি জলে ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া আকুল। এই অল্প সময় মধ্যেই গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল মালোকে লক্ষ্মীঠাকুরাণী আদেশ দিয়া গিয়াছেন স্বপ্নে ঐ পুষ্করিণীর চালায় তাঁর পুজা করিতে এবং যে এই পুকুরে স্নান করিবে তার দুরারোগ্য ব্যাধি থাকিলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবে।

আর যায় কোথা! ঐ পুকুরের চার দিক পরিষ্কার করা হইল। ধুমধামের সঙ্গে পূজা চলিতে লাগিল, মেলা বসিয়া গেল। দূরবর্তী স্থান হইতে পদব্রজে ও ট্রেনে শত শত লোক পূজা দিতে আসিতে লাগিল। আসনে প্রদত্ত এক আনা, দুই আনা, সিকি, আধুলি, টাকা রোজ সংগ্রহ করিয়া মালো হঠাৎ ভাগ্যবান হইয়া গেলেন এক মাসের মধ্যেই।

নিত্য মেলা যখন বসিতে সুরু করিল তখন চোর, বদমাইস, পকেট-মারদেরও পোয়াবারো। একদিন একটি মেয়ে পর্যন্ত নিখোঁজ হইয়া গেল।

আমাদের গ্রামে ঐ সংবাদ পৌঁছামাত্র আমরা দুইজনে (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ও আমি) একদিন এস-ডি-ও সাহেব (মিঃ অ্যালফ্রেড্ বোস) কে গিয়া বলিলাম আপনার মহকুমার মধ্যে মাছপাড়ায় কি সব হইতেছে তার খবর রাখেন কি? তিনি সব শুনিয়া অবাক! একে ক্রিশ্চিয়ান তার উপর উচ্চ শিক্ষিত, তিনি আমাদের অনুরোধে পর দিনই মাছ-পাড়ায় গেলেন এবং ১৪৪ ধারা জারি করিয়া মেলা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য মা লক্ষ্মীর কৃপায় মালো ঐ কয় মাসের মধ্যে বেশ কিছু গুছাইয়া লইয়াছেন ("ভাগ্যবান' হইয়াছেন)! পূজা অবশ্য বন্ধ করা হয় নাই—তজ্জন্য উহা চলিতে লাগিল। তবে চোর পকেটমারদের উৎপাত থাকিল না।

পরে শুনিয়াছিলাম ঐ মালোর জীবনে মা লক্ষ্মীর কৃপায় দারুণ পরিবর্তন ঘটে। যখন তাঁর অর্থের অভাব ছিল, তখন সাধু বা অসাধু উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রতি তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু দৈব কৃপায় যখন অর্থ প্রাপ্তি হইল, তখন হইতে তাঁহার মনের গতি ভগবৎ আরাধনার দিকে চলিয়া যায়। তিনি পূজা অর্চনা লইয়াই মগ্ন থাকেন—অর্থের প্রতি বিতৃষ্ণা

ডাকিলে বোধহয় তাঁহারও দর্শন লাভ করা যায়। মেথরাণীকে বলিল—"তুই ঘরে যা—আমি আর ঘর করিব না।" সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া গেল। মেথর যেন ভিন্ন এক জগতে চলিয়া গেল। গল্পটিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে মেথর যখন বেগম সাহেবার দর্শন লাভ করে, তখন সে তাঁহার চেহারার মধ্যে সর্বৈশ্বর্যময়ী ভগবতীর রূপদর্শন করিয়াছিল, এবং 'মা', 'মা' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহার বেগমের রূপ দেখিবার মোহ কাটিয়া গিয়াছিল।

দীনু চাটুজ্যে মশাই-এর বিবাহ

আগে ইঁহাদের বংশ পরিচয় কিছু দেওয়া যাক্। আনন্দ, দীননাথ, অক্ষয়—ইঁহারা তিন সহোদর। আনন্দের দুই পুত্র ভুবন ও যজ্ঞেশ্বর। দীননাথের একটি মাত্র পুত্র, মথুর। ইনি ছিলেন দার্জিলিং ডেপুটি কমিশনারের হেড্ ক্লার্ক। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ—পোষাক পরিচ্ছদ দেহে ধারণ করিলে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইবে নিশ্চয়। চুলগুলি পর্যন্ত সোনালী রং-এর, কালো নহে। এরূপ মধুর স্বভাব লোক খুব কম দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র ও গিরীন্দ্র। গিরীন্দ্র দার্জিলিং-এর ডাক্তার। সুরেন্দ্র ছিলেন আবগারী বিভাগের ডি-এস-পি, বিবাহ করেন আমাদের আত্মীয় পাবনা পোতাজিয়া নিবাসী শ্যামাচরণ রায়ের কন্যাকে। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে প্রমথ প্রভৃতি থাকেন ভাগলপুরে, ব্যবসা করেন। অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। বিভিন্ন জেলা ঘুরিয়া পাবনা হইতে রিটায়ার করেন এবং ৩২০ মাসিক পেনসন সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ভোগের পর পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে পরলোক গমন করেন। ইঁহার কথা পূর্বে বলা হইযাছে।

এই পরিবারের উন্নতির মূলে ছিলেন দীননাথ চট্টোপাধ্যায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি ছিলেন বগুড়ার মোক্তার—'বাংলার ছোটলাট ক্যাম্পবেল্ সাহেব যখন বগুড়া পরিদর্শনে যান, তাঁকে ধরিয়া অক্ষয়বাবুকে 'ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট' করিয়া দেন (যদিও অক্ষয় বাবু ছিলেন মাত্র এণ্ট্রেনস পাস।) অক্ষয়বাবু পাঠাইতেন টাকা, আর দীননাথ ও যজ্ঞেশ্বর বাড়ীতে দিলেন দালানের পত্তন। গ্রামে সম্পত্তি খরিদ হইতে লাগিল—ক্রমে সংসার জমজমাট।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়—বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর দীননাথ চাটুজ্যে

মশাই-এর মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটিয়া গেল। আর আমরা গ্রামের ছেলেপেলেরা তাঁকে পাইয়া বসিলাম। তখন গ্রামের সকলেরই অবস্থা সচ্ছল, আনন্দ করিবার কিছু পাইলেই সকলে নাচিয়া উঠিত—ছেলে বুড়ো। আরও সুবিধা হইল দীনু ঠাকুরদার ভগ্নী 'অন্নদাঠাকুরাণী' আমাদের দলে ভিড়ে যাওয়ায় তিনি ইন্ধন যোগাইতেন—যাহা বলিতেন তাঁর ভাই তাই বিশ্বাস করিতেন। আর বিশ্বাস করিতেন আমাকে খুব বেশী পরিমাণে।

আমি আসিয়া বলিলাম—"ঠাকুরদা আপনি চান পাঁচিকে বিবাহ করিতে (আমার খুড়তুত ভগ্নী পাঁচি যাহার সঙ্গে রণজয় রায়ের বিবাহ অনেক পূর্বেই হইয়া গেছে); কিন্তু তা কি করিয়া হয়? এই দেখুন—শোভাবাজারের রাজকন্যা আপনাকে পত্র দিয়াছেন। খামের উপর দিকটা ছেলেদের টানা-টানিতে ছিঁড়িয়া গেছে।"

"দেখি, দেখি, কি লিখিয়াছে?"

"আমিই পড়ি, আপনি, আপনি ত পড়িবেনই"—পড়িতে লাগিলাম "আপনি কুলীন সন্তান, আপনার নাম শোনা অবধি আমার মন প্রাণ আপনাতে সঁপিয়া বসিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই আমি গিয়া উপস্থিত হইতে পারি।"

"ঠাকুরদা এ বিবাহ হইলে পাঁচির অদৃষ্টে কি হইবে?"

"আরে গর্দভ, আগে দেখিই না। আজই চিঠি লিখে দে—আসুক।"

তার কয়েকদিন পর। "ঠাকুরদা মশায়, তাঁরা আজই কালুখালী স্টেশনে নামিবে—দিন কটা টাকা, পালকী পাঠাই ও কিছু ভাল খাবার আনাই।" দিলেন ৫ টাকা।

বিকালে গিয়া বলিলাম—"ঠাকুরদা, টাকা কটাই জলে গেল। এই নিন কেবল ১ টাকা, আজ তাঁরা আসেন নাই বড়লোকের মেজাজ তো! হয়তো চিঠিই পান নাই।"

এদিকে অন্নদা ঠাকুরাণী জিদ ধরিলেন—"আমি পাঁচির সঙ্গেই বিয়ে দেবো।" চাটুজ্যে বাড়ীর গা দিয়াই চন্দনা নদীতে যাইতে হয়। পাঁচির ঘাটে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। ঠাকুরদা মশায় রাস্তায় বা ঘাটে বসিয়া থাকিতে লাগিলেন।

তার পর বসন্ত রায়ের বাড়ীতে এক সন্ধ্যায় বিবাহের আয়োজন করা গেল। ঠাকুর্দার কি স্ফূর্তি। ঠাকুর্দাকে বলা হইয়াছিল পাঁচির বাবা নিবারণ ভটাচার্য

যখন মেডিক্যাল কলেজে মারা যান, তিনি উইল করিয়া যান যে যদি দীননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার সম্পত্তি তিনি পাইবেন। অমনি ঠাকুর্দা নাচিয়া উঠিলেন। বসন্ত রায়ের বাড়ীতে সেদিন লোকারণ্য। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। মেয়েরা সব রান্নাবান্না ফেলিয়া গেছেন বিয়ে দেখিতে। দাস পাড়া হইতে একটি বালককে আনিয়া পাত্রী সাজান হইল। এয়ো হইল আমার ছোটভাই যদু, হেমন্ত মজুমদার, আরও অনেকে। উলুধ্বনি, শঙ্খবাদ্য, পুরোহিত, সে এক হৈ হৈ ব্যাপার! অদু ঠাকুর, তিনি যেই মন্ত্র বলিয়াছেন "বলুন 'গয়াগঙ্গা গদাধর' অমনি ঠাকুর্দা ধরিয়া ফেলিয়াছেন "আরে কি বলিস এ যে শ্রাদ্ধের মন্ত্র।" পুরোহিত বলিলেন "আগে পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দিতে হয় না?" ঠাকুর্দা বলেন "তোদের যা ইচ্ছে তাই পড়া।" বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রী ঠাকুর্দার বাড়ী গিয়া অন্নদা ঠাকুরাণীর কাছে জলযোগ করিয়া খিড়কি দ্বার দিয়া চম্পট। তখন ঠাকুর্দা গেলেন ক্ষেপিয়া। তিনি বলিলেন "আমার শত্রুপক্ষ (যাহারা এই বিবাহের বিরুদ্ধে ছিল) আমার বউ চুরি করিয়া নিয়া গেছে, দেখাচ্ছি মজা।" তখনই গেলেন রাজবাড়ী। আমি সেদিন রাজবাড়ী আসিয়াছি, এস-ডি-ও কোর্ট পর্যন্ত গেছেন শুনিলাম। তখন আমি গিয়া বলিলাম "চলুন মোক্তার বাড়ী।" এই বলিয়া এক মোক্তারের কাছে ঠাকুর্দাকে নিয়া গেলাম। মোক্তার সব শুনিয়া বলিলেন "এ চুরির মোকর্দমা টিকিবে না। অন্য পথে যান। শুনিলাম ঐ পাত্রীর সহিত পূর্বেই রণজয় বাবুর বিবাহ হইয়া গেছে। মোকর্দমা করিলে আপনিই উল্টো চুরির ফ্যাসাদে পড়িবেন।" তখন তাঁর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

এখানে বলা দরকার আমার কাকা নিবারণ ভট্টাচার্যের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয়। ঐ সময় রণজয়ের পিতা গিরিজাকুমার রায় মহাশয় ও দেবেন্দ্র চক্রবর্তী কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া এক জাল উইল (খসড়া) প্রস্তুত করেন। তাহাতে উল্লেখ থাকে আমার কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা (পাঁচি)-কে যদি শ্রীমান রণজয়কুমার রায় বিবাহ করে আমার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারা দুজন ভোগ করিবেন। ইত্যাদি।" সম্পত্তিও কম নহে ৫ খাদা (৮০ পাখী=৬৪ বিঘা) খামার জমি ছাড়াও বৎসরে ২০০।২৫০ টাকা আয় আমার দাদা তখন জীবিত। তিনি বাদী হইলেন—যা হউক, শেষ পর্যন্ত ঐ বিবাহই সম্পন্ন হইয়া যায়।

গিরিজাবাবুর তখন অভাবের সংসার। তাঁহার যোগ্য পুত্র নগেন্দ্র রায় (লালন রায়) ২।১ বিঘা করিয়া বিক্রয় করিয়া সব শেষ করেন। ('পড়িয়া পাওয়া ধনের' যে অবস্থা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল।) ঠাকুর্দ্দা যখন মারা যান, তাঁর শ্রাদ্ধ খুব ধুমধামের সহিত হইয়াছিল।

আমরা গ্রামের সকলে খুব আনন্দ করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাই এবং সকলেই তাঁর পারলৌকিক কাজে ও লোক খাওয়ান কাজে খুব খাটিয়াছিলাম। গ্রামের একটি 'আনন্দের খেলা' সাঙ্গ হইয়া গেল তজ্জন্য সকলেই মন-মরা হইয়াছিলাম বেশ কিছু দিন। তারপর যখন রাজবাড়ীর "রমেশ কবিরাজ"কে রতনদিয়া আনা হইল, তখন আবার কিছুদিন তাঁহাকে লইয়া 'খেলা' আরম্ভ হইল।

বেলগাছি রেল স্টেশনে একটি দুর্ঘটনা

কাজী আবদার রজ্জক

রজ্জক ছিলেন যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যের সহপাঠি। বাড়ী কাজিকাদা, রাজবাড়ীর পূর্বদিকে অবস্থিত। রজ্জক তখন বেলগাছির এ-এস-এম। রাজবাড়ী যাইতে হইলে আমাদিগকে বেলগাছি আসিয়া গাড়ী ধরিতে হইত। (তখন কালুখালী স্টেশন হয় নাই) আমরা যখনই বেলগাছি স্টেশনে উপস্থিত হইতাম রজ্জক আমাদিগকে মর্তমান কলা দিয়া অভ্যর্থনা করিতেন (তিনি আগে হইতেই কলা কিনিয়া রাখিতেন আমাদের জন্য)। স্বভাবটি ছিল এতই মধুর যে তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিত। কোন খালাসী, কুলী, মজুরকে গালি দিতে তাঁহাকে দেখি নাই।

রাজগোবিন্দ গোস্বামী (আমার সম্বন্ধী—তিনি তখন কটকে ডাক্তারী পড়েন)-কে লইয়া আমি স্টেশনে উপস্থিত। আমরা দুইজন রাজবাড়ী যাইব। রজ্জক বলিলেন—"ভাই আজ আমাকে গাড়ীর কাছে থাকিতে হইবে আমার 'চাচা' আসিতেছেন এই গাড়ীতে।" গাড়ী স্টেশনে আসা মাত্রই রজ্জক গিয়া ইন্টার ক্লাস কামরার হ্যাণ্ডল ধরিয়া ফেলিলেন, গাড়ী তখনও 'মন্দগতিতে' চলিতেছে গাড়ীর দরজা ছিল খোলা। যেই হ্যাণ্ডল ধরা অমনি গাড়ীর তলায় পড়িয়া গেলেন রজ্জক। অ্যালার্ম চেন টানিয়া গাড়ী থামান হইল বটে কিন্তু রজ্জক গাড়ীর সঙ্গে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আমরা গেলাম ছুটিয়া ও গাড়ীর তলা হইতে টানিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিলাম। তখনও প্রাণ আছে, "আল্লা আল্লা" করিতেছেন। প্ল্যাটফরমে

ছিল বরফের স্তূপ, আমার গায়ে ছিল গরদের চাদর। দেখিলাম তাহার একখানি পা মাত্র কাটা গিয়াছে, ঝুলিতেছে। আমরা দুজনে উঁহার পায়ে বরফ ঘসিয়া দিলাম, শেষে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া অন্য দর্শকদের সাহায্যে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তুলিলাম। গাড়ী প্রায় একঘণ্টা লেট হইয়া গেল। স্টেশন হইতে সরকারী ডাক্তারকে ফোন করিয়া দেওয়া হইল, তিনি যেন হাসপাতালে থাকেন। তাঁহাকে রাজবাড়ী হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর যোগেশ ভট্টাচার্য কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্র সাহায্যে পা খানিকটা বাদ দেওয়া হইল। তারপর দুই মাস ধরিয়া চিকিৎসা। পা কাটা গেল বটে কিন্তু চিকিৎসায় ও পথ্যের সুব্যবস্থায় রোগী পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইলেন। তারপর কৃত্রিম পা লাগান হয়। রঞ্জক পরে সিরাজগঞ্জে বদলী হন এবং কয়েক বৎসর চাকরীর পর রিটায়ার করেন। তারপর রাজবাড়ীতে চাউলের দোকান খুলিবার দুই বৎসর মধ্যেই মারা যান।

তাঁহার চিকিৎসা ও কৃত্রিম পা-এর খরচের কিছু টাকা আমরা ছাত্রদের মধ্য হইতে তুলিয়া দিয়াছিলাম।

রতনদিয়ায় দুর্গোৎসব

আমার পাঠশালায় পড়া হইতে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্যন্ত কয়েক বৎসর রতনদিয়ায় যে দুর্গোৎসবের আনন্দ পাইয়াছি, তাহা স্মৃতিপট হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। তখন রতনদিয়াতে আট বাড়ী পূজা হইত :—গ্রামের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে চন্দনা নদী পর্যন্ত। ১) সান্যাল বাড়ী ; ২) দুর্গাচরণ রায়ের বাড়ী (বর্তমান শ্রীমান অমূল্যচরণ রায়) ; ৩) দুর্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী (বর্তমান নরেন্দ্র) ; ৪) জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ী (বর্তমান প্রদ্যোতকুমার) ; ৫) রাজমোহন রায়ের বাড়ী (বর্তমান সুরথ) ৬) হরকুমার রায়ের বাড়ী (বর্তমান কালিদাস, বল্টু, এবং ভ্রাতাগণ) ; ৭) শ্রীনাথ, জানকী চাটুজ্যের বাড়ী (পরবর্তী বাসিন্দা গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়) ৮) গদাধর ভাদুড়ী (পূর্ণ ভাদুড়ী)।

ষষ্ঠীর দিন হইতেই কয়েক বাড়ী (হরকুমার রায় ; রাজমোহন রায় ; দুর্গাচরণ রায় জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সান্যাল বাড়ী) 'টিকারা' বসিত এবং বিজয়ার দিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত বাজনা চলিত—ঐ বাজনায় অতিভোরে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। হরকুমার রায় ও রাজমোহন রায়—এই দুই

বাড়ীর মধ্যে ভীষণ পাল্লা চলিত। হরকুমার রায়ের বাড়ী হইতে যাত্রা বা দাসু রায়ের পাঁচালী ; রাজমোহন রায়ের বাড়ী হইত কবিগান। লোক জমিত এখানেই বেশী। ঐ বাড়ীর স্থায়ী নাটমন্দিরটি এমন করিয়া সাজান হইত নারিকেল ও কলার কাঁদি সহকারে—যা ছিল এক অভিনব দৃশ্য। রাজমোহন রায় এবং তাঁহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মহিমামোহন সমাদ্দার মহাশয় ছিলেন কবিগানের দারুণ ভক্ত। সমাদ্দার মহাশয় এক পক্ষ লইতেন এবং প্রতি পক্ষের প্রশ্নের পাল্‌টা উত্তর রচনা করিয়া দিতেন—রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণে তাঁহার এমনই অধিকার ছিল যে তাঁহার রচিত উত্তর শুনিয়া অপর পক্ষের ছড়াদার স্তম্ভিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার পক্ষ যে 'চাপান' (প্রশ্নবাণ) দিত, তাহার উত্তর দিতে 'হিমসিম' খাইয়া যাইত। কবিগানেই লোক বেশী জমায়েত হইত—মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। গানের শেষের দিকে দুই পক্ষে ছড়াদার মধ্যে অশ্লীল ভাষায় 'ছড়া' কাটাকাটি হইত—দুই ছড়াদারকে কর্তারা আসরে ডাকিতেন। তারা দুইজনে আসরের মধ্যেই বসিত। একজন ঢোলের বাজনার সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় অপরকে গালি দিত—তার পর অপর ছড়াদার উঠিয়া তাহার কাটান (পাল্টা গালি) দিত। এই সময় মহিলা শ্রোত্রীবৃন্দ উঠিয়া যাইত। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়েই খুব আনন্দ দেখা দিত। কেহ ঘুমাইয়া পড়িলে একজন ঠেলা দিয়া বলিত—"চাচা ওঠ, মোটা লয়ছে"—অর্থাৎ খেউড় আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শুনিতেই যেন আসা। আবার দেখিয়াছি হরকুমার রায়ের বাড়ী যাত্রা গান শুনিতেছে শ্রোতারা শেষের দিকে উঠিয়া গেল দল ধরিয়া রাজমোহন রায়ের বাড়ী দুই ছড়াদারের অশ্লীল ভাষায় ছড়া শুনিতে। লোকে কথায় বলে—"ও বাড়ী যেন দুর্গোৎসব লেগে গেছে"—আমাদের গ্রামে ঐ চার দিন লোকে (স্ত্রীপুরুষ) সত্যই সকলে দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া গিয়া আনন্দে ডুবিয়া থাকিত।—যেন ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব লাগিয়া গিয়াছে! সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা!

পাঁঠা ও মহিষ বলি :—সে এক অভিনব দৃশ্য! বলির বাজনা আরম্ভ হইতেই লোক ছুটিত এ বাড়ী হইতে ঐ বাড়ী—সে সময় কি উন্মাদনা! নিয়ম ছিল, সব বাড়ীর বলি শেষ হইলে হইবে সান্যাল বাড়ী পাঁঠা ও মহিষ বলি। তাই সান্যাল বাড়ীর অতবড় পূজা-আঙ্গিনা লোকে পূর্ণ হইয়া যাইত। "ঐ ঠাকুর মশায় আসিতেছেন" সকলে ধ্বনি দিয়া উঠিত। তিনি ছিলেন অতি শক্তিমান পুরুষ, তাঁর হাতের পেশীর স্থূলতাই তাহা প্রমাণ

করিত। তিনিই দিতেন বলি প্রতি বৎসর। এক "কোপে" বরাবর দিয়াছেন—কোনও দিন তাঁহার হাতে মহিষ "ঠেকে নাই" (এক ঘা-তেই দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে)। বলি শেষ হইলে মহিষের রক্ত মুণ্ড হইতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইত—সে সময়েই বা কি উত্তেজনা!

নিমন্ত্রণ :—বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ—কে কোন বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবে তাহাও সমস্যা! এ তো এ বঙ্গের সার্বজনীন দুর্গোৎসব নয়, সকল বাড়ীই পালা ক্রমে খাইতে হইবে—না খাইলে রাগ অভিমান। বাড়ীর কর্তাই বলিয়া দিবেন—"আচ্ছা যতীন তুমি ঐ বাড়ী যাও—রবি তুমি ঐ বাড়ী যাও—" ইত্যাদি।

ঐ সময় গ্রামের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই ছিল সচ্ছল। অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন সকলের চাইতে বড় চাকুরে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)। সান্যাল বাড়ী ছিলেন চার দারোগা। গোবিন্দ সান্যাল, গগন সান্যাল, গোপাল সান্যাল, গণেশ সান্যাল—(এই বাড়ীই ছিল ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন সান্যাল বাড়ী); মুখুজ্যে বাড়ী ছিলেন দুর্গানন্দ, যাদবানন্দ, বরদানন্দ—তিন জনেই দারোগা। ইঁহারা ছিলেন দিনাজপুর জেলায়। ইংরাজীতে শিক্ষিত না হইলেও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। পুলিস সুপার ইঁহাদের কাজে এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনি বিদায় লইবার পূর্বে বলিয়াছিলেন—"আউর কেতনা নন্দ হ্যায়, সবকো লে আও" (অর্থাৎ 'নন্দ' নামধারী সকলকেই পুলিসে ঢুকাইয়া দিয়া যাইব। জগবন্ধু রায়ের বাড়ী ছিলেন তারিণী রায়, পাবনা জেলায় কোন থানার দারোগা। ইহা ছাড়া আরও কয়েকজন পুলিস লাইনে নিম্নপদে ছিলেন। উত্তর বঙ্গে ঠাকুর স্টেটে তারাস বনমালী রায় বাহাদুরের স্টেটে ও অন্য অন্য জমিদারী স্টেটে নায়েবী করিতেন কয়েকজন। যাঁহারা চাকরি করিতেন না—তাঁহারাও সচ্ছলভাবে সংসার চালাইতেন। রায় বাড়ীর কথা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। সকলেরই স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ হইত বলিয়া তাহাদের আনন্দ করার সুযোগ ও অবসর মিলিত।

পূজার তিন চার দিন পূর্ব হইতেই গ্রামের লোকের উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। সান্যাল বাড়ীর চার দারোগা আসিতেছেন—রায় বাড়ীর দুর্গাচরণ রায় আসিতেছেন বাড়ী প্রকাণ্ড পানসী নৌকায়—পূজার অনেক দ্রব্যজাত লইয়া—উত্তর বঙ্গের উৎকৃষ্ট চাউল, ঘি, ময়দা, পাঁঠা, বস্ত্র, মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

নৌকা গ্রামের ঘাটে পৌঁছাইবার আধ মাইল দূর হইতেই নৌকায় 'টিকারা' বাজিত ও জানাইয়া দেওয়া হইত—কর্তারা পূজোয় বাড়ী আসিতেছেন। আর গ্রামের লোক ছুটিয়া যাইত নদীর ধারে—বলিত 'আজ আসিলেন গোবিন্দ ও গগন সান্যাল, 'আজ আসিলেন দুর্গাচরণ রায় মশায়' এইভাবে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার মধ্যে সকলেই আসিয়া জমিতেন—গ্রামটি হইত জন-কোলাহলে মুখরিত। অক্ষয় চাটুজ্যে মহাশয়ের বাড়ী দুর্গোৎসব হইত না। তাঁহার বাড়ীতে ধুমধামের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। যাত্রা গান দিতেন প্রতিবৎসর বড় বড় দল আনিয়া। তাঁহাদের বাড়ীতেই লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ জন। তাহা ছাড়া চাকর, বাকর, মজুর ত আছেই। তখনকার দিনে গানের সময় ছিল শেষ রাত্র হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত, রাত্রে নহে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহুলোক জমায়েত হইত।

এক বৎসর (আমরা তখন ছোট) পূজার ঠিক পূর্বদিন এক নিদারুণ নৌকাডুবির সংবাদ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। গোবিন্দ সান্যাল ও গগন সান্যাল—উভয়েরই সলিল সমাধি ঘটিয়াছে। তাঁহারা পদ্মার কূল ঘেঁসিয়া আসিতেছিলেন, পদ্মায় তখন দারুণ ভাঙ্গন, বিশাল এক ভাঙ্গা পাড়ের 'চাপ' নৌকার উপর আসিয়া পড়ে। নৌকা যায় তলাইয়া। কর্তারা দুইজনেই মারা গেলেন। সংবাদ দিল এক মাল্লা আসিয়া, সে কোনও রকমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে দৈব অনুগ্রহে। ঐ দুঃসংবাদে গ্রামে পড়িয়া গেল বিষাদের ছায়া, সকলেই ম্রিয়মাণ। কোথায় পূজা, কোথায় মহিষ বলি—সব পণ্ড হইয়া গেল, পুরোহিত ঠাকুর নিজের নামে সংকল্প করিয়া কোনও রকমে মায়ের অর্চনা শেষ করিলেন। ঐ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য অন্য সব বাড়ীর পূজাও নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা ছোট-র দল এই জন্যই অধিক দুঃখিত হইয়াছিলাম—যে আর মহিষ-বলি দেখিতে পাইব না!

প্রতিমা-নিরঞ্জন

এ ব্যাপারটি বিষাদ মাখা হইলেও খুবই উপভোগ্য হইত। আট বাড়ীর প্রতিমা আট খানি জোড় নৌকায় উঠিত, সঙ্গে ঢাক সানাই এর বাজনা, নদীর দুই ধারে শতশত লোক দাঁড়াইয়া আছে, প্রতিমা বিসর্জন দেখিবার জন্য। বিসর্জনেরও বাঁধা নিয়ম ছিল। সমস্ত প্রতিমা আগাইয়া যাইবে মালিয়াট গ্রাম পর্যন্ত—ঐ স্থানে নদীতে বেশী জল থাকিত। হরকুমার রায়ের বাড়ীর প্রতিমা সর্বাগ্রে বিসর্জন দিতে হইবেই। তাহার পর ক্রমে

ক্রমে অন্য সব প্রতিমা। কিন্তু একবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া গেল। রাজমোহন রায়ের বাড়ীর কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবক ঐ বাড়ীর প্রতিমাই প্রথমে বিসর্জন দিয়া দিলেন, তাহার ফলে বাধিল দাঙ্গা—দু-চার জন জখমও হইল। শেষে নিয়ম হয় রাজমোহন রায়ের বাড়ীর প্রতিমা আর মালিয়াট পর্যন্ত যাইবে না—চাটুজ্যের ঘাট পর্যন্ত আনিয়া মুখুজ্যেদের ঘাটের সম্মুখে বিসর্জন দেওয়া হইবে। সেই হইতে যতদিন পূজা চলিয়াছিল, ঐ নিয়মই বহাল ছিল। বিসর্জনের পর বাজনার সঙ্গে গান গাহিয়া বাড়ী ফেরা হইত—"মাকে ভাসিয়ে এলাম জলে—ঘরে গিয়ে মা বলিব কারে? কালী ঘাটের মা গো তুমি—কৈলাসে ভবানী" ইত্যাদি, শেষে বাড়ীতে বাড়ীতে কোলাকুলির ধুম—জাতিনির্বিশেষে। তৎপর হরিরলুট-ভাঙ-পানীয় ইত্যাদিও চলিত। তখনকার দিনে গ্রামে বেশ মদ চলিত—আমরা দেখিয়াছি। আমরা ছেলের দল বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রণাম করিয়া আসিতাম এবং 'পারিশ্রমিক স্বরূপ' মিলিত, মোয়া, মুড়কি, বাতাসা, কদমা নাড়ু ইত্যাদি।

শ্রীসুকুমার চাটার্জি, এম-এ, বি-এল্

(সদর এস-ডি-ও, পাবনা)

ও

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান হরিশঙ্কর চাটার্জি

আমি যখন সারা মাড়োয়ারী স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম, সুকুমার বাবু ছিলেন পাবনার সদর এস-ডি-ও এবং উক্ত স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। এই চাটুজ্যে পরিবার কলিকাতা ভবানীপুরের একটি বনিয়াদী বংশ, এবং ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। একদিন সুকুমার বাবু আমার সারার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমি একটি অনুরোধ লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, এ অনুরোধটি রক্ষা করিতেই হইবে আপনাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"আমার একটি ভাইপো, পিতৃমাতৃহীন। তাহাকে পাবনা জেলা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছি, পড়াশুনা কিছুই করে না। আমার খাতিরে স্কুলে নাম আছে মাত্র, সারা দিন বন্ধু বান্ধব লইয়া আড্ডা দিয়া বেড়ায়। ডি-এম (মিঃ আর. এম. দাস—ইনি পূর্বে রাজবাড়ীর এস-ডি-ও ছিলেন) আপনার কথা বলিয়াছেন—আপনার হাতে দিলে ছেলে সায়েস্তা হয়, তাই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি, ইহার পড়ার খরচ প্রতিমাস আমি ১০০৲ দিতে প্রস্তুত আছি।" আমি বলিলাম "ঠিক

আছে, তবে ১০০৲ কেন লাগিবে? ৩০৲ যথেষ্ট। বোর্ডিং চার্জ মাত্র ৫৲ ইত্যাদি।” একদিন হরিশঙ্কর আসিল। সুন্দর চোহারা, অতি বিনয়ী, নিয়মিত স্কুলে যায় ও পড়াশুনা করে। তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই। ভাবিলাম সহজেই ইহাকে গড়িয়া তুলিতে পারিব। কিন্তু সে যে তলায় তলায় বেশ একটি দল গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার কিছু মাত্র আভাষ পাই নাই। ১০।১২ টি ছেলে লইয়া তাহার দল। তাহাদিগকে বলিয়াছে—“আমি যা বলিব তা করিতে হইবে, না করিলে কলিকাতা হইতে গুণ্ডা আসিবে ও আঙ্গুল কাটিয়া লইবে। আমি ‘হিপনটিজম’ জানি, আমার অবাধ্য হইলে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া দেব—ইত্যাদি।” ছেলেরা সভয়ে কম্পমান এবং অল্পদিন মধ্যে তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে অনুগত হইয়া পড়িল।

একদিন এক মুসলমান দোকানী (বাজারে তাহার ষ্টেশনারী দোকান আছে) আসিয়া কাঁদিয়া বলিল “সার, আমার সর্বনাশ হইয়া গেছে। ঐ যে ডেপুটি বাবুর ভাইপো হরিবাবু কতকগুলি ছেলে নিয়া আমার দোকানে গিয়া অনেক জিনিষ লুট করিয়া আনিয়াছেন—সামান্য ২।১ টি জিনিষ কিনিয়াছেন মাত্র, মাল মিলাইতে গিয়া দেখি অনেক জিনিষই নাই। আপনি ইহার বিচার না করিলে আমি গরীব মানুষ মারা যাইব।” আমি হরিশঙ্করকে ডাকাইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল “আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” আমি তখন বলিলাম “জিনিষগুলি এক্ষুনি সব আনিয়া আমার টেবলের উপর রাখ। তা না হইলে আমি তোমাকে এখনই দারোগার হাতে দেবো, তিনি তোমাকে পাবনায় চালান করিয়া দিবেন, তখন তোমার কাকার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। তা ছাড়া, তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত, তোমার যখন যে টাকার দরকার হইবে, আমার কাছে চাহিলেই পাইবে। এই নাও ১০ টাকা তোমার হাত খরচের জন্য দিলাম, ফুরাইয়া গেলে আবার চাহিবে। আমি শুনিয়াছি রাইটার্স বিল্ডিং-এ তোমার আর এক কাকা মোটা মাহিনার চাকুরি করেন। তুমি ম্যাট্রিক পাস করিলেই ১০০ টাকায় ঢুকিয়া যাইবে। আজকাল একজন বি-এ এম-এ ৬০--৭০ টাকার চাকরি পায় না—তা জান?” ইহাতে আশ্চর্য ফল হইল। হরিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ সমস্ত জিনিষপত্র আনিয়া আমার টেবলের উপর রাখিল এবং বলিল “সার, আমি ভাল করিয়া পড়াশুনা করিতে চাই। পৃথক একটি রুম দিন।” তখন ৪টি দালান লইয়া স্কুল বোর্ডিং, ২৪।২৫টি ঘর এবং ৭০

জন মেম্বর। হরিশঙ্করকে একটি ছোট ঘর দিলাম তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য। তখন হইতে খুব মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল—তাহার সাধের ক্লাব তুলিয়া দিল, ছেলেরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। হরি সিগারেট খাইত খুব বেশী। তাহাকে বলিলাম "উহা ছাড়িতে হইবে। প্রথম সপ্তাহে মাত্র তিনটি, দ্বিতীয় সপ্তাহে দুইটি, তৃতীয় সপ্তাহে একটিও না।" সে রাজী হইল।

একদিন রচনা লিখিতে দিয়াছিলাম ক্লাসে—তোমাদের বাল্য জীবন সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ। কোন 'এসে' বই থেকে মুখস্থ করা 'এসে' নহে, বাল্যে যাহার জীবনে প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছে তাহাই নিজের ইংরাজীতে লিখিবে। হরিশঙ্কর লিখিয়াছিল—নৌকাযোগে তাহারা (বাবা, মা, ভাই, বোন) যখন কলিকাতা আসিতেছিল, নৌকাডুবিতে সব মারা যায়, সে-ই এক মাত্র জীবিত ছিল। পরে জানিয়াছিলাম ঘটনা সত্য। তাহার বাবাও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—তিনিও ঐ ঘটনায় প্রাণ হারান। হরিশঙ্কর নিজের ইংরাজীতেই লিখিয়াছিল 'ওয়াটারী গ্রেভ' (Watery grave), 'ক্যাপসাইজড' (Capsised), ও আই ওয়াজ দি ওনলি সারভাইভর (I was the only survivor)। এই তিন কথার প্রয়োগ দেখিয়া আমি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, যে ছেলে এইরূপ শব্দের প্রয়োগ করিতে জানে, তাহাকে কিছুদিন পূর্বে পাইলে ইহাকে অনায়াসে প্রথম বিভাগে পাস করাইতে পারিতাম। যাহা হউক, হরিশঙ্কর দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহার কাকা আমাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। বলিয়াছিলাম—"আমি আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র, আমাকে কোন পুরস্কার দিলে আমাকে ছোট করা হইবে।"

কিশোর কালই বালকদের চরিত্র গঠনের সময়। এই সময় ভাল গাইডেন্স না পাইলে তাহাদের বিপথে পা দিবার সম্ভাবনা বেশী। এইরূপ কত ছেলে ধ্বংসের পথে পা বাড়াইতেছে, শুধু পথ প্রদর্শকের অভাবে, তাহার কি হিসাবে আছে? সুকুমার বাবু পাবনা হইতে বাঁকুড়ায় বদলী হইয়া আমাকে একখানি সার্টিফিকেট পাঠাইয়াছিলেন, উহা এখনও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। তার পর তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই, তিনি ও হরিশঙ্কর আজ ইহজগতে, না পরলোকে তাহাও জানিতে পারি নাই।

তবে হরিশঙ্করের কথা যখন মনে হয়, যথেষ্ট আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি।

সেই চাষার মেয়েটি

অনেক দিন আগের কথা। একটি চাষার মেয়ের কাছে যে আতিথেয়-তার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকিবে। ভদ্র সমাজে আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে—অনেকে কোন সম্মানিত অতিথিকে যে অভ্যর্থনা বা সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে নিজের ঐশ্বর্য দেখানোর ইচ্ছাটাই বিশেষ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। "আমার বাড়ীতে আজ অমুক আসিয়াছিলেন" প্রকাশ করিয়া বিশেষ গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু আমাদের চাইতে যাহারা নিম্নস্তরে অবস্থিত, যাহাদের আগ্রহ থাকিলেও, আতিথেয়তা দেখাইবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের কাছ হইতে যে আপ্যায়ন লাভ করা যায় তাহা খাদবিহীন জিনিষ।

আমি যখন রাজবাড়ীতে রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করিতাম, কিরূপ বিপন্ন হইয়া এক চাষীর বাড়ীতে আশ্রয় ও যত্ন পাইয়া-ছিলাম তাহাই আমার মনের দুয়ারে মাঝে মাঝে ঘা দেয় এবং মনে এই প্রশ্ন জাগে ভদ্রতায় কে বড়—আমরা না ঐ চাষীর মেয়েটি?

কাহিনীটি এই—রাজবাড়ীর চার মাইল উত্তরে পদ্মানদী। পদ্মার পর-পারে আমার এক বন্ধুর বাড়ী। বন্ধুর পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা চাই-ই।

জ্যৈষ্ঠ মাস। মাঠ ধু-ধু করিতেছে। যেমন রৌদ্রের তেজ, তেমনি গরম। যখন পদ্মার ধারে গিয়া পৌঁছাইলাম, তখন বেলা ৪টা। খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে হইবে। অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় আরম্ভ হইয়া গেল। ধূলো বালুতে কোথায় মাটি, কোথায় জল কিছুই দেখা যায় না। আমার গায়ে ছিল গরদের চাদর, তা দিয়া চোখ মুখ ঢাকিলাম, নদীর পাড় দিয়া দৌড়াইতে লাগিলাম। প্রতিপদেই ভয় হইতেছিল পদ্মাগর্ভে না পড়িয়া যাই। তারপর আরম্ভ হইল বৃষ্টি ও শিলাপতন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে উঠিলাম গিয়া এক মুসলমান বাড়ীর গোয়াল ঘরে। একঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন বৃষ্টি থামিল না, তখন আমার ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে একটি মেয়ে উত্তর দিল, বাড়ীর মালিক রাজবাড়ী হাটে গিয়াছে, ফিরিতে রাত্তির

হইবে। মেয়েটি আমাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে বলিল। গিয়া দেখি, যে ঘরে তাহারা বাস করে, ছাউনী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মেয়েটি কয়েকটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে। ঐ দৃশ্য দেখিয়া আমি গোয়াল ঘরেই ফিরিয়া গেলাম। মেয়েটিকে আক্ষেপ করিতে শুনিলাম—"আমি আমীর সর্দারের বেটি, আমার বাপজান রাস্তার লোক ধরিয়া আনিয়া বাড়ীতে খাওয়াত, আর আমার এমনই 'অদেষ্ট' যে এক ভদ্রলোকের ছেলেকে বসিতে দেয়ার স্থানও আমার নাই।" রাত্রি ৯টা নাগাদ মেয়েটির স্বামী বাড়ী ফিরিল এবং আমাকে গোয়ালঘরে দেখিয়া বলিল "আপনে?" আমি নিজের পরিচয় দিলাম। ভয় হইতেছিল সত্যই যে এবার গলাধাক্কা না দেয়। কিন্তু চাষী হইলে কি হয়, দেখিলাম লোকটির হৃদয় আছে। ঐ চাষীর বাড়ীর ভিতরে দোচালা একখানি ঘর ছিল 'ছোন' বোঝাই। সে ছোনগুলি সাজাইয়া তাহার উপর চার খানি তক্তা পাতিয়া এক খানি কাঁথা দিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং তক্তা পাতিবার যে কারণ বলিল, তাহাতে ঘুম আসা ত দূরের কথা, সারা রাত বসিয়া থাকিতে হইল। সে বলিয়াছিল, "কত্তা পোকামাকড়ের কথা কিছু বলা যায় না।" পোকামাকড় মানে, সাপ। যাহা হউক, ভোর হইতেই রাজবাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম। তখন কৃষকটি বলিল, "আমার বাড়ীতে চিড়ে গুড় আছে, কুয়ো থেকে পানি তুলিয়া নিয়া 'নাস্তা' করিয়া যান, কাল রাত্তিরটা উপোস গেছে।" আমি অবশ্য কৃষককে ধন্যবাদ দিয়া, 'খোদা তার মঙ্গল করুন' জানাইয়া বিদায় লইলাম। পথে বারবারই মনে হইতে লাগিল—'ইহারা আমাদের চোখে ছোট কিসে?'

বাড়ী আসিবার পথেই পড়ে ব্রজেন্দ্র বাবু উকিলের বাসা। ব্রজেন বাবু সবে ঘুম হইতে উঠিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কি হে এত সকালে কোথা হইতে?" আমি উত্তর দিলাম—"আগে স্টোভটা ধরান। পরে কুটুম বাড়ীর গল্প শুনিবেন।"

হায়রে সে দিন। সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে? আজিকার দিনে ঐরূপভাবে বিপন্ন হইলেও কি ঐ আমীর সর্দারের 'বেটির' বাড়ী যাইতে আমার সাহস হইত? মনে পড়িয়া গেল একটি পুরনো কথা—রতনদিয়ার অদূরে কালুখালিতে মরাগঙ্গার ধারে আমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীবাড়ী আছে। তখন একখানি চালা ঘর মাত্র সম্বল। তাহার

ভিতরে আছে কালী মূর্তি। ঘরখানি ঝড়ে পড়িয়া গেলে হিন্দু মুসলমান চাঁদা তুলিয়া ঘরখানি মেরামত করে। অল্প কয়েক ঘর মাত্র হিন্দুর বসতি। আমি ৺পূজার খরচ প্রতি বৎসর ৫ টাকা ১০ টাকা দিতাম। অবশিষ্ট হিন্দুরাই চাঁদা তুলিয়া পূজা নির্বাহ করিত। একবার বন্যায় ধান পাট নষ্ট হইয়া যাওয়ায় হিন্দুরা যখন পূজা করিতে অনিচ্ছা জানায় স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান আসিয়া আমাকে বলে "বাবু, পূজা বন্ধ করিতে পারিবেন না—আমরা চাঁদা তুলিয়া পূজোর খরচ দেবো। ঐ দেবতাকে আমরাও ডরাই—তা ছাড়া বদনামের ভয়ও আছে। লোকে বলিবে মুসলমানেরা পূজো করিতে দেয় নাই।" অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা লইবার প্রয়োজন হয় নাই—তবে তাহাদের ঐরূপ আগ্রহ হইতেই বুঝিতে পারা যায় তখনকার দিনে হিন্দু মুসলমানের কিরূপ প্রীতির বন্ধন ছিল।

রাজবাড়ীতে একটি মুসলমান সভা

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল একটি সভার কাহিনী। বিবরণটির মধ্যে হাস্যোদ্দীপক কিছু থাকিলেও তখনকার দিনে হিন্দু মুসলমান—দুই জাতির মধ্যে কিরূপ সম্প্রীতি ও পরস্পরের মধ্যে কিরূপ নির্ভরতা ছিল উহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম হইতে একজন মৌলানা আসিয়াছেন, সঙ্গে কয়েকজন মৌলবীও আছেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া মুসলমানদের মনে বিষ ছড়াইয়া দিতেছেন। রাজবাড়ীর সভায় প্রায় ৩ হাজার মুসলমান সমবেত হইয়াছেন। হিন্দুও কিছু সংখ্যায় উপস্থিত আছেন। মৌলানা সাহেব উঠিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো অনেক কিছুই বলিয়া গেলেন। "দেখ ভাই সব, ইংরাজ নহে, হিন্দুরাই আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে—ছোট বড় সরকারী কাজে হিন্দুদেরই প্রাধান্য। আমরা কয়জন চাকরী পাই? আমরা নাকি অশিক্ষিত, মূর্খ! এখন হইতে তোমরা সজাগ হও—হিন্দুর বাড়ী চাকরী করিতে যাইবে না, 'ঘরামী'র কাজে যাইবে না, হিন্দুর ভাত খাইবে না—ইত্যাদি।" ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী মহকুমার দুই জন নাম করা মোক্তার—গোবিন্দচন্দ্র রায় ও চন্দ্রনাথ লাহিড়ী। গোবিন্দ রায় মহাশয় ছিলেন খুব স্পষ্টভাষী ও হাস্য-রসিক। তিনি মৌলানা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি দুইচারিটি কথা বলিতে চাই।" তিনি অনুমতি দিলেন, "হাঁ, হাঁ, বলুন।" তখন রায় মহাশয়

বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব, আপনি আমাদের মুসলমান ভাই-দিগকে যে যে উপদেশ দিলেন, শুনিলাম। কিন্তু আপনার বোধ হয় ভুল-হইয়া গিয়া থাকিবে আর একটি উপদেশ দিতে। আপনার বলা উচিত ছিল—'হিন্দুর বাড়ী চুরি করিতেও যাইবে না।' তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। দেখুন, আমি মোক্তারী করি—এই মহকুমায় যত চুরি মোকর্দমা হয়, দেখিতে পাই আসামী শ্রেণীতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। অবশ্য হিন্দুর মধ্যেও বাগদী, ডোম, মুর্দাফরাস কিছু কিছু আছে। আমাদের এই অঞ্চলের মুসলমানেরা বড় গরীব—তাহারা হিন্দুর বাড়ী কাজকর্ম করিয়া, দুধ বেচিয়া কোনও রকমে সংসার চালায়। আজ একজন মুসলমানের ঘরে চাউল বাড়ন্ত হইলে পাশের হিন্দুবাড়ী হইতে চাউল কর্জ লয়, কোন হিন্দুর বাড়ীতে লঙ্কা, তরিতরকারী না থাকিলে পাশের বাড়ীর হানিফের মার কাছ হইতে নিয়া আসে। মুসলমানদের অনেকেরই অনটনের সংসার। টাকার দরকার হইলে হিন্দু মহাজনের শরণাপন্ন হয়। তারপর ধান পাট জন্মাইলে বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করে। তারপর ধরুন, পাংশার হাজী সাহেবের দর্গায় হিন্দুরা মানত (মানসিক) করে; গোপালপুরে আছেন ৺রাজ রাজেশ্বর। কোন হিন্দু বা মুসলমানের সন্তান জন্মাইলে ঐ দেবস্থলীতে সন্তানের জন্য মানসিক চুল দিয়া আসে। এই ভাবে যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান যেন এক মায়ের গর্ভের দুই সন্তান—সম্প্রীতির সহিত বাস করিয়া আসিতেছে। আপনি ত রাত্রের গাড়ীতেই অন্য মোকামে চলিয়া যাইবেন—তৎপূর্বে ইহাদের কি করিয়া সংসার চলিবে, তাহার ব্যবস্থাটাও করিয়া যান।" মোক্তার বাবুর বলা শেষ হইলে সব মুসলমান "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি দিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিল। তাহারা বলিল—"আমরা মৌলানা ছাহেবের কথা শুনিবো না, মোক্তার বাবুর কথাই মানিবো।" সভা পণ্ড। মৌলানা সাহেব পালাইবার পথ পান না। এই ছিল সে দিনের পরিবেশ। আর আজ? পাকিস্তানের ঝড়ে ছিন্ন মূল হইয়া আমরা পথহারা পথিক সব বিপন্ন, বিপর্যস্ত।—কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। সর্বনাশা দেশ-বিভাগ আমাদিগকে শুধু নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত করিয়াছে তাহাই নহে, আমাদের মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। আমরা এ জৌলুসপূর্ণ ভেজাল শহরে পরিবেশে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছি কি? সর্বদাই মনে পড়ে কবি মুকুন্দ দাসের কথা—"স্বদেশ

স্বদেশ করিস তোরা—এ দেশ তোদের নয়!"

ঐতিহ্যময় প্রাচীন সান্যাল বাড়ী

দুই রায় বাড়ীর কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মত এই সান্যাল বাড়ীও ছিল যেমন বনিয়াদী সেইরূপ ঐতিহ্যময়। এই বাড়ীতে চার জন ছিলেন দারোগা এবং একজন স্পেশাল রেজিস্ট্রার। ভূসম্পত্তির আয়ে ও চাকরির বেতনে ইঁহারা ছোট খাট জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন এই বাড়ীরই দৌহিত্র সন্তান। স্পেশাল রেজিস্ট্রার যোগেশচন্দ্র ছাড়া আর চার জন গোবিন্দ, গগন, গণেশ, ও গোপাল। ইঁহারা কেহই ইংরাজী জানিতেন না। ইঁহাদের হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষার দাপটেই লোকের থরহরি কম্প উপস্থিত হইত। যিনি যে জেলায় কাজ করিতেন সেখানকার পুলিস-সুপারেরা ইঁহাদের কার্য কুশলতায় খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। কোন থানার অধীনস্থ গ্রামগুলিকে এমনই শাসনে রাখিতেন যে, "দারোগা আসিতেছেন" শুনিলেই লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। তখনকার দিনে ঐ কারণে অপরাধ প্রবণতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আমি গোবিন্দ সান্যাল ও গগন সান্যাল মহাশয়গণকে দেখিয়াছিলাম বটে, তবে তাঁহাদের চেহারা মনে পড়ে না, কারণ আমার বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর মাত্র—তবে গণেশ ও গোপাল সান্যাল মহাশয়দিগের কথা ভাল ভাবেই মনে অঙ্কিত হইয়া আছে।

গণেশ সান্যাল মহাশয় ছিলেন নাজিরগঞ্জের দারোগা। মফঃস্বলে দাঙ্গায় একটি লোক প্রাণ হারাইয়াছে—গণেশ সান্যাল মহাশয় তদন্তে যাইবেন ঠিক সেই সময় বৃহৎ আকারের একটি রোহিত মৎস্য উপহার স্বরূপ থানায় আসিয়া গেল। সান্যাল মহাশয় তদন্তে গেলেন না—আহার শেষ করিয়া যাইবেন এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন অকুস্থানে। কনস্টেবলকে বলিলেন— "তোম আগারিমে যাও। আমি খাওয়া দাওয়া করিয়া আয়েঙ্গে।" কনস্টেবল গিয়া জানিতে পারিল, পুলিস সাহেব ছিলেন মফঃস্বলে নিকটস্থ গ্রামে। তিনি অগ্রেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত শেষ করিয়া গিয়াছেন। দারোগা বাবুর উপর রাগিয়া টং। শুনিয়াছি শেষ পর্যন্ত ঐ অপরাধেই চাকুরি যায়। এই প্রসঙ্গে দারোগা তারিণী রায় মহাশয়ের 'হিন্দী' মনে পড়িল। তিনি একদিন চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, এতনা বড় বড় বাঁশ কাটলাম একঠো একঠো করে কে নিয়ে গেল?

গোপাল সান্যাল মহাশয় যখন বরিশাল জেলা হইতে 'রিটায়ার' করিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন, তখন আমি রাজবাড়ী স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমি রাজবাড়ী হইতে বাড়ী আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াছেন একখানি সরকারী চিঠি হাতে, বলিলেন—"দেখত বাবাজী, লাট সাহেব নাকি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি চোখের অসুখের জন্য পেনশনের রোলে নাম সহি করিতে পারিব না—তজ্জন্য তিনি আমাকে 'টিপসহি' দিয়া পেনশন 'ড্র' করিবার অনুমতি দিয়াছেন—এবং তাঁহার নাম সহির উপরিভাগে "আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য" লিখিয়াছেন। ইঁহারা এক একজন এক এক জেলায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পেনশন বেশী দিন ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই তাই দুঃখ হয়। আমি উত্তর করিলাম, "ঠিক তাই—দুঃখ প্রকাশ করা ব্যাপারটা হইল সাহেবদের 'এটিকেট' মানে সৌজন্য বা শিষ্টাচার, আর কোন লোককে চিঠি লিখিতে হইলেই (এমনকি সে যদি মুচি মেথরও হয়) 'আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য'—কথাটি লিখিবেই।"

এই সান্যাল বাড়ীর কথা বলিতে গেলেই সৌদামিনী দিদির কথা মনে পড়িয়া যায়। ইনি ছিলেন 'সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা'। কি মধুর স্বভাব—মিষ্টভাষণ। গ্রামের সকল ছেলে মেয়েরাই যেন তাঁহার নিজের সন্তান। বসন্ত রায়, অম্বিকা রায়, লোকনাথ রায়, সতীশ রায় আমার দিদির কাছে গিয়া দাঁড়াইলে, না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। ইনি ছিলেন—স্বর্গত গণেশ সান্যাল মহাশয়ের কন্যা, যশোহর জেলায় ফাজিলপুর গ্রামের প্রিয়নাথ মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রী এবং প্রমথনাথ, প্রবোধ, প্রফুল্ল ও রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের জননী। প্রিয়নাথ মৈত্র ছিলেন, ডি. এম. সাহেবের অপিসের হেড্ ক্লার্ক। মাঝে মাঝে রতনদিয়া আসিতেন এবং গ্রামের ছেলেদিগকে খুব স্নেহ করিতেন। এসব কথা আগে বলা হইয়াছে।

পরবর্তী যুগের বংশধরেরা সেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল কই? --দেশ বিভাগের ফলে তাহারা পশ্চিমবঙ্গও অন্যান্য রাজ্যে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, মাথা গুঁজিবার একটু স্থান করিয়া লইতে ব্যস্ত। অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস!

মধ্যবিত্ত

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির লেখা পড়িয়াছিলাম—

"আমরা সেই মধ্যবিত্ত—নবযুগের প্রকৃত পথ প্রদর্শক। আমরা সকলের আগে স্কুলে সন্তান পাঠিয়েছিলাম, জেলে যাওয়ার দিনেও আমরা সকলের আগে কারাগারের উদ্দেশে পা বাড়িয়ে ছিলাম। আমাদের সন্তানেরা আইন শিখে উকিল হয়েছে, আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করে ডাক্তার হয়েছে, এনজিনিয়ার হয়েছে, শিক্ষক হয়ে ঘরে ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছে। আবার আমাদের সন্তানেরাই হাজার হাজার কলেজ আদালত পরিত্যাগ করেছে, দেশে স্বাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়েছে।

"আর আজ? আজ আমাদের কেউ যেন আর চেনে না। আমরা কোথায় আছি কেউ তা খবর করে না। আমরা কি খাই, কি পরি, কি ভাবি, কখন হাসি, কেন কাঁদি, আজ আর কেউ তা ভাবে না। ইত্যাদি।"

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি নিজের অবস্থার ধিক্কার দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের সকলকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। কাঁদিলে চলিবে না—হাসিতে হইবে। চিকিৎসকেরা বলেন, যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে, সে দীর্ঘজীবী হয়। তাই আপনাদের মনে একটু আনন্দ দিবার জন্য কয়েকটি হাসির গল্প পরিবেশন করিতেছি।

'ইওর ডাফটার'

আজকাল যেমন রেলওয়ে বিভাগে শিক্ষিত লোকের ছড়াছড়ি, এমন কি স্কুল ফাইনাল পাস করিতে না পারিলে রেলওয়ে কর্মচারীর ছেলেও রেলে ঢুকিতে পারে না, তখনকার দিনে এমন ছিল না। সামান্য কিছু ইংরাজীতে জ্ঞান থাকিলেই সহজে চাকুরী লাভ হইত। সেই সময় কোন এক সিগনালার এক তার ধরিলেন "ইওর ডটার ইল, স্টার্ট ইমিডিয়েটলি।" তারবাবু ছুটিলেন বড়বাবুর কাছে। গিয়া বলিলেন, "সার, ডাফটার মানে কি?" বড়বাবুর বিদ্যাও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, তিনি বলিলেন, "তোমার দপ্তরীর অসুখ, শীঘ্র এস।"

'বড় সাহেবের লাঠি'

তখন সবে উত্তরবঙ্গে রেলপথ খোলা হইয়াছে। ঐ দেশের সাধারণ অধিবাসীদের মনে ধারণা ছিল রেল এঞ্জিন দৈত্য বিশেষ; এঞ্জিনের

হুইসল শুনিলেই তাহারা আতঙ্কে দিশাহারা হইত। কয়েকদিন যাত্রীই জুটিল না। বড়বাবু, ছোটবাবু সকলেই চিন্তিত। তাঁহাদিগকে বসাইয়া রেল কম্পানী বেতন দিবে না। টেলিগ্রাফে সংবাদ ও মালপত্র পাঠান চলে গুজব শুনিয়া একদিন একজন নিরক্ষর লোক আসিয়া তারবাবুকে বলিল, "বাবু, আমি বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার মেয়ের বিবাহ দিয়াছি গত মাসে; জামাই-ষষ্ঠীর আর মাত্র দুই দিন বাকী। এক হাঁড়ি সন্দেশ ও জামাই-মেয়ের কাপড় যদি আপনি দয়া করিয়া টেলিগ্রাফে পাঠাইয়া দেন।" তারবাবু বলিলেন, "ঠিক আছে—জিনিষপত্র লইয়া আইস।" সাদাসিদে মানুষ, বাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া জিনিষপত্র আনিয়া হাজির করিল এবং ইহার কয়েক দিন পরে আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবু জিনিষপত্র কিছুই যায় নাই; আমার মেয়ে কাঁদিয়া কাটিয়া পত্র দিয়াছে তাহার শাশুড়ী "তত্ত্ব" না পাইয়া খুব চটিয়া গিয়াছে।" তারবাবুও খুব দুঃখের ভান করিয়া বলিলেন, "বাপু হে, কি করিব বল, বড় সাহেব লাঠি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, এদিক হইতে যাইতেছে মিষ্টির হাঁড়ি ও কাপড় ঐ দিক হইতে আসিতেছে লাঠি; পথে ঠোকাঠুকি, হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ দেখ কাদামাখা তোমার দেওয়া কাপড়, বাড়ি নিয়া যাও।" লোকটি বলিল, "বাবু সবই আমার অদৃষ্টের দোষ!"

'কাউস্ মিল্ক মাউথ সার'

(Cow's Milk Mouth, Sir.)

আমি যখন রাজবাড়ি স্কুলে পড়ি, তখন রাজবাড়ি ষ্টেশনে একজন নামকরা ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। সকলের মুখেই এককথা—এমন ষ্টেশন মাষ্টার আর হয় না। তিনি ইংরাজী যাহা জানিতেন তাহা কাজ চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কার্যকুশলতায় ও সুমিষ্ট ব্যবহারে খুবই তুষ্ট ছিলেন। একদিনের ঘটনা—বড়সাহেব আসিয়া বড়বাবুকে ষ্টেশনে না পাইয়া তাঁহার কোয়ার্টারে যান এবং গিয়া দেখেন বড়বাবু তাঁহার গাই দোহান দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সাহেব বলিলেন, "আর ইউ হিয়ার?" "ইয়েস সার।" "হাউ মাচ মিলক ডাজ ইওর কাউ গিভ?" "কাউস মিলক মাউথ সার।" সাহেব উহার এক বর্ণও বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলেন, তখন বড়বাবু বুঝাইয়া দিলেন "অ্যাজ মাচ ইউ ঈট, সো মাচ ইউ গিভ।" তখন সাহেব

বুঝিতে পারিলেন—গরুকে যে পরিমাণ খাওয়ান যায় সে সেই পরিমাণ দুধ দেয়।

'ঝুট বাত মত বোলো, তুম ভি কাঁঠাল খায়াথা'

কোন মহকুমা হাকিমের (সাহেবের) এক কেরানী সাহেবকে একটি কাঁঠাল উপহার দেন, কিন্তু কিভাবে উহা ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানান নাই। সাহেব মেম দুইজনে অনেক চেষ্টার পর কাঁঠালটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, ফলে দুইজনেরই হাতে বিস্তর আঠা লাগিয়া যায়। উহা কিছুতেই ছাড়াইতে না পারিয়া মাথায় মুছিতে থাকেন। তারপর পরামাণিক ডাকিয়া উভয়েরই মাথা মুড়িতে হয়। সাহেব হ্যাটে মাথা ঢাকিয়া কোর্টে যান। ঠিক সেই দিন অন্য একজন কেরানী মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় আসিয়া সাহেবকে বলে, "সার, আমার মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ১৫ দিন কাজে অনুপস্থিত ছিলাম।" সাহেব তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, "ঝুট বাৎ মত বোলো, হাম্ ভি কাঁঠাল খায়াথা, মেম সাহেব ভি কাঁটাল খায়াথা, তুম ভি কাঁঠাল খায়াথা।" ফলে কেরানীটি ছুটির বেতন পাইলেন না এবং যে কেরানী কাঁঠাল উপহার দিয়াছিল, তাহার বদলির হুকুম হইল। সাহেব সুবিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মহাখুসী।

'আলু দোষ'

চাকুরির সন্ধানে একটি লোক এক বাড়ি গিয়া উপস্থিত। গৃহকর্তা বলিলেন, "কি চাই?" লোকটি বলিল "আজ্ঞে, একটি চাকুরি চাই।" কর্তা বলিলেন "দিতে পারি কাজ। মাসে কত বেতন চাও?" সে উত্তর দিল "আজ্ঞে, আপনি যা খুশি দেবেন। তবে একটা নিবেদন—আমার একটি দোষ আছে, তা মাপ করিয়া নিতে হইবে।" কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?" সে বলিল, "আজ্ঞে, 'আলু দোষ'; 'আমি দয়ালু', কোন দুঃখীলোক দেখিলে আমার হাতের কাছে যা পাইব তাহাকে দিয়া দিব। তারপর আমি 'নিদ্রালু'—আমি একটু ঘুমাই বেশী, 'ভয়ালু'—আমার ভূতের ভয় থাকায় রাতে ঘরের বাহির হইনা। এবং 'ভোজালু'—আমার আহার সবার চাইতে বেশী বলিয়া আমাকে কেহ রাখিতে চাহেনা।" গৃহকর্তা বলিলেন, "কুছ পরোয়া নাই, 'পিঠালু' দিলেই তোমার আলু দোষ ভাল হইয়া যাইবে।"…

'মেঘদূত রচয়িতা'

স্কুল ইনস্পেক্টর গ্রাম্যস্কুল পরিদর্শনে গিয়া একটি ছেলেকে প্রশ্ন করেন, "মেঘদূত কার লেখা ?"

ছেলেটি ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলে, "বিশ্বাস করুন, আমি লিখি নাই, সার।"

পরে ভদ্রলোক রহস্যচ্ছলে সেই গ্রামের স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে কথাটা জানাইলে প্রেসিডেণ্ট উত্তেজিত হইয়া বলেন, "ভারী মিথ্যুক মশায় আমাদের গ্রামের ছেলেরা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ হতভাগাই লিখিয়াছে।"

একটি বারেন্দ্র পরিবারের মেয়ের বিবাহ

রাজবাড়ীতে একটি প্রতিবেশী পরিবার বাস করিতেন। দুই বাড়ীর মধ্যে এমন মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা সচরাচর দেখা যায় না। গোপালচন্দ্র রায় (বারেন্দ্র) তখন নারায়ণগঞ্জের Ex. Engineret (X E N) অফিসে কাজ করিতেন—বাড়ীর ভার আমার উপরেই একরূপ ছিল বলা চলে। তাঁহার বীণা নামে একটি বয়স্থা কন্যা ছিল। মেয়েটি ১৫-১৬ বৎসরেই এত মুটিয়ে গেল যে এক ভারিক্কী গিন্নি ঠাকুরাণীর মত দেখাইত। তখনকার দিনে বারেন্দ্রর কোন মেয়েকে বিবাহ দেওয়া ছিল খুবই ব্যয় সাধ্য। মেয়ের দেহ ক্রমে মুটিয়ে চলিতেছে নারায়ণগঞ্জের 'শীতলাক্ষের' জলের গুণে। তাহাকে কৃশ করিবার উদ্দেশ্যে ম্যালেরিয়ার আদিগ্রাম রাজবাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া হইল। অনেক চেষ্টাতেও উপযুক্ত পাত্র মেলে না। শেষে স্বয়ং প্রজাপতিই একটি সুপাত্র জুটাইয়া দিলেন। শান্তিপুর হইতে এক ভদ্রলোক আসিলেন—বরের পিতা। আমার ডাক পড়িল। গিয়া তাঁহার সহিত আলাপে সত্যই মুগ্ধ হইলাম। পাত্রী দেখা মাত্রই তিনি পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার দাবী কি ? মেয়েটিকে যখন পছন্দ করিয়াছেন দয়া করিয়া উহাকে আপনার পুত্রবধু করিয়া নিন।" তিনি বলিলেন—"আপনারা কত ব্যয় করিতে পারেন যাহাতে আপনাদিগকে দেনা করিতে না হয় ?" আমি তখন বলিলাম "দেখুন কনের পিতা মাত্র ১২৫৲ বেতন পান। ১ হাজার টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে আছে মাত্র ঐ মেয়ের বিবাহের জন্য, আর কিছু সোনারূপা, তা আপনি নিয়া যান।" তিনি বলিলেন—"না ঐ সোনারূপায় যা যা গহনা হইতে পারে তৈয়ারী

করুন। আর আপনাদের বাড়ীর খরচ তো আছে। ৪০০ টাকা রাখিয়া বাকী ৬০০ আমাকে দিলেই চলিবে।" আমি ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া আশ্চর্য বনিয়া গেলাম। ভাবিলাম তাহা হইলে এমন উদার প্রকৃতির লোকও পৃথিবীতে আছে।

তারপর কথায় কথায় যখন শুনিলাম, তিনি একজন মস্ত 'গাইয়ে' অমনি তাঁহাকে পাইয়া বসিলাম। আমাদের সংঘ তো ঠিকই ছিল—প্রথম দিন ঐ কনের বাড়ীতে ও পরের সন্ধ্যায় রেল ইনস্টিটিউটে তাঁহার গান হইল রাত্রি ১২টা পর্যন্ত। সকলকে মুগ্ধ করিয়া তৃতীয় দিন শান্তিপুর রওনা দিলেন।

এই বিবাহের পাত্রটি বি-এস সি পাস। তিনি (বরের পিতা) বলিলেন "আমার এখনও দুইটি বয়স্থা ভাইঝি অবিবাহিতা—কোথাও উপযুক্ত পাত্র পাইতেছি না। তাই বলিয়া আপনাদের কাছ হইতে পীড়ন করিয়া কিছু টাকা লইলে কি আমার ভাইঝির বিবাহ ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া যাইবে? তবে প্রজাপতির করুণা থাকিলে তিনি অনেক সময় অঘটন ঘটাইয়া দেন" এই বলিয়া একটি গল্প বলিলেন—"আমার একটি ভাইঝির পাত্র অনুসন্ধান করিতে গিয়া দুই তিন স্থানে বিফল মনোরথ হইয়া একজন নামকরা উকিলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। সব মক্কেল যখন উঠিয়া গেল তিনি আমাকে বাড়ির ভিতরে এককক্ষে বসাইয়া রাখিয়া ভেতরে গেলেন এবং (এখানে বলা দরকার পাত্রী দেখা আগেই হইয়া গিয়াছিল এবং পাত্রী পছন্দও হইয়াছিল, শুধু কথাবার্তা পাকা করিতেই আমি তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম) কুষ্ঠীর মত ভাঁজ করা একখানি কাগজ আমার হাতে দিলেন, তাহা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। আমি বলিলাম 'আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে আপনি আমাকে উপহাস করিতেছেন কারণ এই লম্বা কাগজে যদি ১ টাকা করিয়াও প্রতি আইটেম লেখা থাকে তাহা দিবার সাধ্যও আমার নাই।' তিনি বলিলেন 'আপনি গুরুজন, আপনাকে আমি উপহাস করিব? খুলিয়াই দেখুন উহার ভিতরে কি আছে?' তখন আমি খুলিয়া দেখি ঐ কাগজে লগ্ন পত্র ইত্যাদি লেখা আছে ও সর্বশেষে ১ টি টাকা ও ধান দুর্বা সহ পাত্রীকে আশীর্বাদ। আমার মন তখন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শুভকার্য নির্দ্দিষ্ট দিনে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। প্রজাপতিকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।"

এই 'পণপ্রথা' যতদিন আমাদের সমাজজীবনে কণ্টক হইয়া থাকিবে

ততদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের কোন আশা নাই।

বিবাহে ঘটকালি

আমি 'ঘটক' শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, ঘটকালিতে যে সিদ্ধ হস্ত ছিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আমার সাহায্যে ও চেষ্টার ফলে আমাদের নিজ পরিবারে ও বন্ধু বান্ধবদের অনেকগুলি বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং খুব আনন্দের সহিতই আমি এসব শুভ মিলনে অগ্রণী হইয়া কাজ করিয়াছিলাম। নিম্নে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলাম।

(১) পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামের শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র অন্নদাচরণ রায়ের সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর বিবাহ।

(২) ঝাঁসি (ইউ-পি) নিবাসী (যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র) গোপাল (হৃষিকেশ) চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহ। গোপাল ছিলেন এম-এ, ঝাঁসি স্কুলের শিক্ষক।

(৩) অধুনা বরাহনগর নিবাসী শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (বি-এ) সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী বীণা দেবীর বিবাহ।

(৪) অধুনা রানাঘাট নিবাসী শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী ইলা দেবীর সহিত আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দৌহিত্র ইন্দুভূষণ মৌলিকের বিবাহ।

(৫) পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রাম নিবাসী শ্যামাচরণ রায়ের কন্যার সহিত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (ডি-এস-পি) বিবাহ। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

(৬) ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রী ও সূর্যকুমার অধিকারীর কন্যা সরসীবালার সহিত আমার আত্মীয় ও বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ।

(৭) আমাদের পূর্ব নিবাস ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামের মাণিকচন্দ্র রায়ের ভগ্নীর কন্যা 'হারানির' সহিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ। উপেন্দ্র ছিলেন রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউসনের শিক্ষক ও সঙ্গীতজ্ঞ।

(৮) অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী বীণা দেবীর

সহিত রতনদিয়া গ্রামের নগেন্দ্রকুমার রায়ের পুত্র শ্রীমান সৌরীন্দ্রকুমার রায়ের (কালিদাসের) বিবাহ।

(৯) লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমার গুহরায়ের পুত্র শ্রীমান সৌরীন্দ্রমোহনের সহিত বহরমপুরের জমিদার যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ। এই বিবাহে কাসিমবাজারের মহারাজা স্বনামধন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(১০) অধুনা নৈহাটি নিবাসী শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের সহিত আমার জামাতা শ্রীমান অমূল্যকান্ত চক্রবর্তী (এল-এম-এফ)-র ভগ্নী শ্রীমতী সুধারাণীর বিবাহ।

(১১) রাজবাড়ীর ইনজিনিয়ার অফিসের কর্মী গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা বীণা দেবীর সহিত শান্তিপুর নিবাসী একটি বি-এসসি পাত্রের বিবাহ। (নামটি মনে পড়িতেছে না)। এ বিবাহে আমাকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

আমার তিন কন্যার বিবাহ

রতনদিয়া নিবাসী গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (বি-এ অনার্স, বি-টি) সহিত আমার প্রথমা কন্যা পরিমল-বাসিনীর (পুটু) বিবাহ।

২। বাণীবহ গ্রামের শ্রীমান অমূল্যকান্ত চক্রবর্তীর (এল-এম-এফ) সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা শতদল বাসিনীর (সাবিত্রী) বিবাহ।

৩। পূর্বনিবাস ফরিদপুর জেলার ফুকুরা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান জগন্নাথ ভট্টাচার্যের সহিত—আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীর বিবাহ। ইহারা এক পুত্র এক কন্যা সহ, আমার ছাড়িয়া আসা রতনদিয়ার বাড়ীতে বসবাস করিতেছে। ইহাদের দুই কন্যা মায়া ও অর্চনা 'মাইগ্রেশন' করিয়া কলিকাতা আসে। তাহাদিগকে আমার দুই পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ, ও আমি পাত্রস্থা কারিয়াছি, কলিকাতা বরাহনগরে। পাত্রদের নাম যথাক্রমে শ্রীকপিলমুনি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মালকুমার চক্রবর্তী। এই দুই বিবাহে পাত্র যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছেন—কোন পক্ষই পণ গ্রহণ করেন নাই।

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য

আমার মধ্যস্থতায় উপরিউক্ত শুভকার্যগুলি সম্পন্ন হওয়ায়, কোন

পাত্র পক্ষই 'পণের' দাবি তোলেন নাই—এ বিষয়টি আমার বিচার বুদ্ধির উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন—ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

অতিথি আপ্যায়ন

অতিথি সেবা অতীতে একটি বিশিষ্ট পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করা হইত এবং প্রত্যেক জমিদার, রাজা মহারাজার বাড়ীতেই অতিথি সেবার জন্য একটি করিয়া আলাহিদা আঙ্গিনা থাকিত। যেমন দেবালয়ের জন্য পৃথক আঙ্গিনা থাকিত। তখন রেল স্টীমার ছিল না, হাঁটা পথে চলিতে চলিতে যদি কোন জমিদার বাড়ী, বা সম্পন্ন গৃহস্থের নাম শোনা যাইত, সেই বাড়ীতেই অতিথি গিয়া উঠিতেন এবং যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। তখনকার দিনে লোকের এই ধারণাই ছিল 'সর্বদেবময়োতিথি'—অতিথিকে দেবতা মনে করা হইত। পরমহংস দেবের সহচর ছিলেন 'নাগমহাশয়', তাঁহাকে পরমহংসদেব তাঁর দেশে পাঠাইয়াছেন দেশের কাজের জন্য। তিনি তাঁর আদেশ পাইয়া দেশে যান। একদিন অসময়ে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অতিথি সেবা করিতেই হইবে। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর যে আহার্য প্রস্তুত ছিল তা সব অতিথিকে ধরিয়া দিয়া দুজন উপবাসী থাকিলেন। অতিথি রাত্রিবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁরা তাঁকে তাঁদের শয্যায় স্থান দিয়া দুজনে বাহির হইতে রাতটা কাটাইয়া দিলেন (রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল—তা গ্রাহ্য না করিয়া।) ইহাকে বলে অতিথি সেবা।

আমাদের চার বন্ধুর মধ্যে স্থির হয় এনট্রেন্স পরীক্ষা শেষ হইলেই (১৮৯৪) আমরা টুর করিতে বাহির হইব। প্রথমে যাইব নিজ জেলা ফরিদপুর, তারপর জেলা যশোহরে মামুদপুর রাজা সীতারাম রায়ের বিখ্যাত কালী বাড়ী, কেল্লার ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি দেখিতে। একদিন সকাল ৬টায় চার বন্ধু দেশভ্রমণে রওনা হইলাম। তখন রাজবাড়ী ফরিদপুর রেল পথ বিস্তৃত হয় নাই, ঘণ্টায় ৪ মাইল করিয়া হাঁটিয়া যাইব এবং ৩ ঘণ্টা পর যেখানে পৌঁছাইব, কোন বাড়ীতে অতিথি হইব। ১২ মাইল শেষ করিয়া যখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় খুব কাতর হইয়া পড়িলাম, একজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা ভাই, এখানে কোথায় গেলে আহার মিলিবে?" সে উত্তর দিল "কেন, ঐতো সামনে ঈশান দাস মশায়ের বাড়ী—সেখানে যান, তিনি খুব বড় লোক এবং অতিথি গেলে খুব খুসী হন।" আমরা সেই বাড়ীতে

গিয়া উপস্থিত, তখন কি উপলক্ষে যাত্রাগান হইতেছে, আমরা আসরে গিয়া বসিলাম। গান একঘণ্টা পর শেষ হইল, এবং আসর খালি হইয়া গেল। আমরা চার জন বসিয়াই থাকিলাম, তা দেখিয়া ঈশান দাস মশাই স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞসা করিলেন—"আপনারা ?" আমি বলিলাম—"আমরা চার বন্ধু লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্যকুমার গুহরায় মহাশয়ের বাড়ীতে থাকি, এবারে এনট্রেনস পরীক্ষা দিয়া দেশ ভ্রমণে বার হইয়াছি।" তিনি বলিলেন "বেশ, আপনারা আজ আমার অতিথি-এ বড় ভাগ্যের কথা !" বলিয়া আমাদের সেবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের দুজনের গলায় পৈতা দেখিয়া তিনি আমাদের পায়ের ধূলা লইলেন ভক্তিতে গদ গদ হইয়া। ইনি সেই ঈশানচন্দ্র দাস, যাঁর নামে ফরিদপুর ঈশানচন্দ্র হাই স্কুল—জেলা স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিত। দেখিয়া অবাক হইলাম যত লোক আহারে বসিল, সকলের পাতেই মাছের মুড়ো। ইনি ছিলেন জলকরের নায়েব, কাজেই যে-কোন অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ মাছ আসিত। যা হাউক, বিকাল চারিটায় আমরা যখন যাইতে চাহিলাম, দাস মহাশয় কিছুতেই যাইতে দেবেন না। বলিলেন "আপানারা ছেলে মানুষ, অবেলায় কোথায় যাইবেন ?" আমি কাল প্রাতে নিজের লোক সঙ্গে দিয়া আপনাদিগকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেবো।" আমরা রাত্রিবাস করি নাই। "আবার আসিব" বলিয়া বিদায় নিয়া আমরা ৩-৪ মাইল হাঁটিযা ফরিদপুর গিয়া পৌঁছাইলাম। একেই বলে অতিথি সেবা। আজ সে দাস মশাই-ও নাই, সে অতিথিশালাও নাই। তবে 'কীর্তি যস্য স জীবতি'। তিনি স্বধামে চলিয়া গেলেও, তাঁর নাম, কীর্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ফরিদপুরবাসীদের মনে।

কোথায় গেল সেই আতিথেয়তা ? আগেকার দিনে কোন বাড়ীতে অতিথি আসিলে গৃহস্বামী নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। আর আজ ? কোন অতিথির আগমন হইলে গৃহস্থ হয়ত মনে করেন—'ঐ যা, রেশনের ২০০ গ্রাম চাউল চলিয়া গেল।' অতিথিরাও সাবধান হইয়া গেছেন—পারতপক্ষে কেহ অসময়ে কোন বাড়ী যান না এবং গৃহস্থকে বিব্রত করেন না। আমার একটি প্রাক্তন ছাত্র এম্-এ পাস করিবার পর একজন ধড়িবাজ ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়িয়া তাঁর মেয়েকে বিবাহ করে (পিতামাতার অজ্ঞাতে)। অসবর্ণ বিবাহ নয় অবশ্য। পিতা যখন

সংবাদ পাইলেন, অসন্তুষ্ট হন নি, বিশেষ করিয়া যখন শুনিলেন ঐ ভদ্রলোকই তাঁর ছেলেকে চাকুরি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি একদিন কৃষ্ণনগরে বৈবাহিকের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত—বৈবাহিক তখন অফিসে বাহির হইতেছেন। আগন্তুকের পরিচয় পাইয়া বলিলেন "এতদিনের পর বেয়াই মহাশয়ের পায়ের ধুলো পড়িল এ বাড়িতে! তা আপনি ত অনুরোধ করিলেও থাকিবেন না, আবার আসিবেন—চলি।" আগন্তুক তা শুনিয়া অবাক। তিনি কোন হোটেলে গিয়া উঠিলেন, এবং ফেরত গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আমার সঙ্গে যখন দেখা হইল ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে গালগালি দিয়া তাঁহার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিলেন। তিনি আর কোন দিন বেয়াই মশাইয়ের বাড়ীতে ত যান-ই নাই, পুত্র-মুখও দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

এই অতিথি সেবা লোপ পাইল কেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন; রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদার, তালুকদার, জোতদার, এবং সম্পন্ন গৃহস্থের সকলেই এই আইনের প্রকোপে পড়িয়াছে। তা ছাড়া আজ হইতে ৭০ বৎসর পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি ১মন চাউলের দাম ২-৩ টাকা। আজ ১কিলো চাউলের দাম ২ টাকা বা তার কাছাকাছি। রেশনে যে চাউল পাওয়া যায় তা অতি কদর্য, পরিমাণে এতই কম যে পুরো সপ্তাহ চালানো দুষ্কর হইয়া পড়ে।

কলির প্রহ্লাদ

৫০ বৎসর আগেকার কথা। সমগ্র ফরিদপুর জেলা তখন জগৎবন্ধু প্রেমে মাতোয়ারা। সভা-সমিতি কীর্তনের মাধ্যমে তখন সকলেরই মুখে "জয় জগৎবন্ধু বল, হরি বল, হরিবল—পুরুষ জগৎবন্ধু মহা উদ্ধারণে" ছাড়া কথা নাই। জগৎবন্ধু তখন ফরিদপুর গোয়ালচামটে স্বীয় আশ্রমে সমাধিস্থ, কেহই তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারে না। প্রতি বৎসর বার্ষিক অনুষ্ঠানে দশ সহস্রাধিক ভক্ত ও জনসাধারণের সমাগম হইত।

ঐ সময় রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউসনে ১২ বৎসর বয়স্ক একটি বালক পাবনা জেলার কোন পল্লী হইতে আসিয়া ভর্তি হয়। বালকটি ধীর, শান্ত এবং অতি নির্মল প্রকৃতির; বোর্ডিং হাউসে তখন ৯০টি স্কুলের ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক থাকিতেন। ছেলেটির ব্যবহার ছিল এত মধুর যে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ ছিল না। বহুকাল হইতেই তাহার ধর্মের

দিকে মতিগতি প্রকাশ পায় এবং রাজবাড়ী আসিবার কিছুদিন পর হইতেই জগৎবন্ধুর মূর্তি (ফোটো) সম্মুখে রাখিয়া নির্জনে ধ্যান করিতে থাকে। একদিন তাহার ঘরে গিয়া দেখিলাম তাহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে—ডাকিলে সাড়া নাই। তখনই বুঝিলাম 'ভাব' হইয়াছে। এই 'ভাব' অন্য ছেলেদের মধ্যে সংক্রমিত হইলে স্কুলের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। তাহার পিতাকে পত্র দিলাম, তিনি আসিয়া যেন তাঁহার ছেলেকে গৃহে লইয়া যান। তিনি আসিলেন এবং অনেক উপদেশবর্ষণে অকৃতকার্য হইয়া ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালকটির উত্তর শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক! —"আপনি পিতা, জন্মদাতা, আমার দেহের উপর আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—আপনি আমাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিতে পারেন—কিন্তু আমার মনের উপর আপনার কোন অধিকার নাই। আমি কিছুই অন্যায় করিতেছি না! যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, তাঁহাকে ডাকা প্রত্যেক জীবেরই কর্তব্য, ইত্যাদি।" আমরা তখন তাঁহাকে বলিলাম "ছেলেকে বাড়ি লইয়া যান, কিন্তু ইহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিবেন না, করিলে হিতে বিপরীত হইবে।" ইহার পর জানিতে পারি নাই, ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবনে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহাকে পূর্বজন্মের কর্মফল না বলিয়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা—এমন কি ছেলেটির নাম পর্যন্ত মনে নাই, তবে তাহার কথাগুলি চিরদিন মনে থাকিবে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি

সারা ভারত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যে ভরা। উত্তর হিমাচল হইতে দক্ষিণ কোমরিন পর্যন্ত যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, রহস্যের সীমা নাই এবং এই সব অতি প্রাচীন রহস্য ভেদের জন্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অক্লান্ত প্রচেষ্টারও অবধি নাই। সমগ্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির কথা বাদ দিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পল্লীর আশে পাশে যে সব পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা কম বিস্ময়কর নহে; অথচ ইহার কোন ইতিহাস নাই—যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই লোকমুখে শোনা এবং তজ্জন্য নির্ভর যোগ্য নহে। তবে ইহাদের প্রাচীনতাই আমাদের পূর্বপুরুষদিগের ঐতিহ্য, জীবন-ধারা ও সম্পদের কথা মনে করাইয়া দেয় এবং তাহাতে আমাদের মন শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ভরিয়া ওঠে। আমি ফরিদপুর ও যশোহর জেলার কয়েকটি চিত্র আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই গুলির মধ্যে ভুলভ্রান্তি

থাকা খুবই সম্ভব। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যদি ঐ গুলির তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন, তাহাতে আনন্দিত হইব।

১। রাজরাজেশ্বর

গোয়ালনন্দ মহকুমা অধুনা বেলগাছী রেলষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে গোপালপুর ৺রাজরাজেশ্বরের গাছ ও তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। এই দেবতার নাম সম্বন্ধেও দ্বিমত আছে। আমার বিশেষ বন্ধু পরলোকগত মুকুন্দলাল গোস্বামী (এম-এ, বি-এল) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঐ বৃক্ষের প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের পূর্বপুরুষেরা সন্দেহ নাই, তবে "৺রাজরাজেশ্বরী" নামও পূর্বে প্রচলিত ছিল। প্রতি মঙ্গলবার দেবতার পূজা হয় ও মেষ বলি হয়। হিন্দু মুসলমান ঐ দেবতার নামে মানসিক (মানত) করে এবং সন্তান জন্মিলে তাহার মাথার চুল ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। সকলেই বলে—'দেবতা জাগ্রত'। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে ঐস্থানে মেলা বসে—তাহাতে বহুলোক সমাগম হয়।

একটি প্রণয়-কাহিনী বহুদিন হইলে চলিয়া আসিয়াছে ঐস্থান জুড়িয়া। গভীর রাত্রে বিভিন্ন গ্রাম হইতে যুবক যুবতী আসিয়া ঐ স্থানে মিলিত হয়। যুবক ঐ স্থানে অপেক্ষা করিত; যুবতী মাথার উপরে বসান একটি হাঁড়িব মধ্যে আলো লইয়া দূরগ্রাম হইতে আসিত, গ্রামের লোকেরা কেহ মনে করিত আলেয়া, কেহ বলিত ভূত প্রেত; কেহ মনে করিত হর গৌরীর মিলন। যাহা হউক, ভয়ে কেহই নিকটে যাইত না। গ্রামের একটি সাহসী যুবক রহস্যভেদ করিতে গিয়া প্রাণ হারায়। উহারা দুজন যখন মিলিত হয়, তখন ঐ দৃশ্য দেখিয়া যুবকটি জ্ঞান হারায়—ঐখানেই তাহার শেষ।

২। একটি পুরাতন মন্দির

রাজবাড়ি রেলষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে বাণীবহ গ্রামে 'নাওয়ারা' জমিদার বাড়ী অবস্থিত। সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে উক্ত জমিদার-দের পূর্ব পুরুষ যুদ্ধের জন্য নৌকা (নাও) সরবরাহ করিতেন, তজ্জন্য সম্রাট তাঁহাকে 'নাওয়ারা' উপাধি ও তৎসহ জমিদারী প্রদান করেন। জমিদার আগ্রা হইতে রাজমিস্ত্রী আনাইয়া মন্দিরটি নির্মাণ করেন। গত ৩০০ বর্ষ অতীত হইয়াছে কিন্তু মন্দিরের কারুকার্য এখনও অটুট আছে, দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, তখনকার শিল্পকলা কত উন্নত ধরনের ছিল। বর্তমানে গ্রামটি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছে এবং অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ

ভগ্ন মন্দিরটি দাঁড়াইয়া আছে।

৩। গাজী সাহেবের দরগা

ফরিদপুর জেলার পাংসা রেলষ্টেশন হইতে একমাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই দরগাটি অতি প্রাচীন। হিন্দু মুসলমান এখানে সিরণী (সিন্নি) দিয়া থাকে জাতি নির্বিশেষে, এবং যাহা মানত করে, তদনুযায়ী ফললাভ হয় এইরূপ জন-শ্রুতি আছে।

৪। দেউল-মথুরাপুর

ফরিদপুর জেলার মধুখালির সন্নিকটে মথুরাপুর গ্রামে অবস্থিত। দেউলটির উচ্চতা বর্তমানে ৭০-৮০ ফুট, উহা নির্মাণকালে ১৫০ ফুট ছিল শোনা যায়। ইহার নির্মাতা কে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ বলে 'রাজা সীতারাম'; তিনি যখন পথ দিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিতেন, তাঁহার কিছু নিদর্শন রাখিয়া যাইতেন।

৫। বৈষ্ণব-ঝোলা

ইহা কিন্তু আসলে একটি বৃক্ষ। বৃক্ষটি হয়তো এখন আর নাই, কিন্তু তাহার ইতিহাস খুবই উপভোগ্য। বৃক্ষটি ফরিদপুর জেলায় রামদিয়া, সোনাপুর গ্রামের অদূরে অবস্থিত ছিল। তখন নীল কুঠির আমল। নীল কুঠির সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী 'নীল-দর্পণ' পড়িয়াই আপনারা অবগত আছেন। কুঠিয়াল সাহেবরা জোর জবর-দস্তি করিয়া উৎকৃষ্ট ধানের জমিতে নীলের আবাদ করিত। একদিন কোথায় মহোৎসব (মচ্ছব) ছিল, এবং দলে দলে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা উহাতে যোগদান করিতে মাঠের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। এতগুলি লোককে একত্রে যাইতে দেখিয়া সাহেবের কৌতূহল হয়, তিনি বরকন্দাজ দ্বারা উহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন উহারা কোথায়, কিজন্য যাইতেছে এবং গেলে সেখানে কি পাইবে। একজন বলিল, "প্রসাদ (খাবার) ও এক আনা দক্ষিণা পাই।" "আমি তোমাদের প্রত্যেককে চার আনা দিব" বলিয়া সাহেব হুকুম দিলেন—"ঐ গাছে তোমরা ঝোলা রাখ এবং মাঠে কাজ কর।" তাহাই করিতে হইল। যেহেতু সাহেবের হুকুম। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে প্রত্যেকে চারি আনা দক্ষিণা ও ঝোলা লইয়া অভুক্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিল।

৬। একটি পুষ্করিণী

ফরিদপুর জেলায় বেলগাছী স্টেশনের অদূরে মুরারিখোলা ও হারোয়ার

মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা এক বৃদ্ধার কৌতুকপূর্ণ গল্প। রাজা সীতারাম সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি যখন দেশভ্রমণে বাহির হইতেন, একদল 'কোরাদার' (যাহারা পুষ্করিণী খনন করে) সঙ্গে যাইত, তাহার নিদর্শন যশোহর ও ফরিদপুর জেলার বহুস্থানে পাওয়া যায়। পুষ্করিণী খনন ছিল রাজা সীতারামের মহান কীর্তি। তিনি যখন সদলবলে ঐ পল্লীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এক বৃদ্ধা গিয়া কাঁদিয়া বলে, "বাবা, জল বিনা আমার ছাগল মারা যায়।" সীতারাম শুনিয়া বলিলেন, "বটে! এখনই তোমার ছাগলের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।" পুষ্করিণী এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, সে বুড়ীও নাই, রাজা সীতারামও নাই; কিন্তু রাজার উদারতার সাক্ষ্য বহন করিয়া আছে ঐ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি।

৭। চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গি

গোয়ালনন্দ মহকুমার অন্তর্গত ইষ্টবেঙ্গল রেলপথে বেলগাছী স্টেশনের পশ্চিমদিক দিয়া 'হরাই' নামে একটি নদী প্রবাহিত! উহা পদ্মানদীর শাখা নদী। পুরাকালে উহাই পদ্মা নদী ছিল, বর্তমানে উহা শাখা নদীতে পরিণত হইয়াছে। তখনকার দিনে পদ্মানদীর দারুণ বেগ ছিল। ঐ নদীতে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গি নিমজ্জিত হয়—এইরূপ প্রবাদ লোকমুখে শ্রুত হয়, একটি 'ঢিপি' এখনও বর্তমান আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বর্তমান বসবাসকারী লোকেরা বলে—'ঐ স্থানে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গি নিমজ্জিত হইয়াছিল।'

৮। একটি খেজুর গাছ

গোয়ালনন্দ (রাজবাড়ি) মহকুমা হইতে যে ডি, বি রোড ফরিদপুর গিয়াছে, উহারই ধারে শিবরামপুরের সন্নিকটে একটি আশ্চর্য ধরনের খেজুর গাছ ছিল, গাছটি সূর্যাস্তের সময় মাটিতে শুইয়া পড়িত এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উঠিয়া মধ্যাহ্ন কালে ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইত। ইহা এতই বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়ায় যে উহা দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক সার জগদীশচন্দ্র বসু এবং তৎপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (?) গাছটি দেখিয়া আসেন। প্রকৃতির অদ্ভুত লীলা ছাড়া আমরা ইহাকে আর কি বলিব?

৯। একটি কালী বাড়ি

যশোহরের রাজা সীতারাম রায়,—যিনি একদিন দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে

উপস্থিত করিতে বাদসাহ সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। মাহমুদপুরে উক্ত রাজার প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীতে একদিন এক ফকিরের আবির্ভাবে রাজা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। রাজা সস্ত্রীক মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখেন, এক ফকির কালীবাড়ির দরদালানে বসিয়া আছে। রাজা বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে? আমার মায়ের মন্দির অপবিত্র করিলে কেন?" ফকির রাজার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বুঝিলাম তুমিই রাজা সীতারাম! আমার ধারণা ছিল, রাজা সীতারাম মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। এখন দেখিলাম, তুমি মূর্খ ছাড়া কিছু নও। তুমি স্থির হইয়া বস। তুমি কি বলিতে চাও, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তিনি তোমার ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে বসিয়া আছেন? আমরা দুজনে যেখানে বসিয়া আছি তিনি সেখানে নাই?" রাজার সহিত ফকিরের অনেকক্ষণ তর্ক চলিবার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কখন আপনার দর্শন লাভ করিব?" ফকির উত্তর করিলেন, "রাজা, আমি আগামী বৎসর ঠিক এই তিথিতে এখানে উপস্থিত হইব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ত দেখা হইবে না, তাহার পূর্বেই সেনাপতি মানসিংহ আসিয়া তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যাইবেন।" রাজা ফকিরের কথা শুনিয়া নির্বাক, নিস্পন্দ।

১০। ফেরিফণ্ডের রাস্তা

এই রাস্তাটি অতি প্রাচীন। ইহা সম্ভবত বাংলার নবাবের আমলে প্রস্তুত হইয়াছিল—মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাধারণ লোকে ইহাকে 'ফেরিমেণ্টের রাস্তা' বলে। ফরিদপুর জেলায় পাংসা হইতে মধুখালি হইয়া ফরিদপুর পর্যন্ত ইহার কতক অংশ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন রেলপথ হয় নাই, এই রাস্তাই গাড়ী ঘোড়া—লোক চলাচলের একমাত্র রাস্তা ছিল। বর্তমানে ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

ইনি বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। সাহিত্যিক হিসাবেও ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

রাজবাড়ি ফৌজদারী আদালতের হেড-ক্লার্ক রামচরণ ধর মহাশয়ের কন্যা সরযূবালা ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র সরোজকুমার ও ইনি উভয়েই রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউসনের প্রাক্তন ছাত্র। সরোজকুমার ১ম

বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। ইনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

শ্রীমান সন্তোষকুমারও ঐ স্কুল হইতে ১ম বিভাগে পাস করিয়া কলিকাতা আসেন এবং বি-এ পাস করিবার পর সংবাদ পত্র অফিসে যোগদান করেন। শুনিয়াছি, স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ইঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার সহায়তায়ই সন্তোষকুমারের ভবিষ্যৎ-জীবন সুগঠিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাহাতে ভারতীয় পত্রিকাগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান পায় তজ্জন্য, ইনি লণ্ডন, জার্মানী অ্যামেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং বহু সাংবাদিক আসরে যোগদান করিয়াছেন। সাংবাদিক ক্ষেত্রে এঁর ভূমিকা রীতিমত গৌরবের।

ছাত্রাবস্থা কালেই ইঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছি। আমার অগণিত ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, শ্রীমান সন্তোষকুমার তাঁহাদের অন্যতম।

মাতৃভূমি বিরশাল হইলেও বাল্যকাল হইতে ইঁহারা রাজবাড়ির বাসিন্দা। ধর মহাশয়ের পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল কয়েকটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা সরযুবালা পুত্র দুইটিকেই স্নেহপূর্ণ কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দেশ করেন—তাহার ফলে ছেলে দুইটি দুইটি রত্নরূপে গড়িয়া ওঠে। ইঁহাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ কোন দিন শুনি নাই। ধর মহাশয় ছিলেন আমার নিকটতম প্রতিবেশী। আমার জমির এক অংশ নিয়া সেখানে গৃহ নির্মাণ করেন। ঐখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমান সন্তোষকুমারের কলিকাতা বাস-ভবনে সরযুবালা পরলোক গমন করেন। আমার মনে একটি বেদনা এখনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় এবং আমাকে খুব বিমনা করিয়া তোলে—কারণ, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বারবার অনুরোধ জানান সত্ত্বেও ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন যাইতে পারি নাই। শেষে যেদিন শুনিলাম সরযুবালা ইহ জগতের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেদিন মনে সত্যই বড় বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম।

শ্রীমান সন্তোষের পিতা সুরেশচন্দ্র কলিকাতা থাকিয়া একখানি সংবাদ পত্র পরিচালনা করিতেন। মাসে মাসে রাজবাড়ি আসিতেন। তবে শ্রীমানের শিক্ষাভার মাতা ও দাদুর (ধর মহাশয়) উপরেই ন্যস্ত ছিল। তরুণ বয়সে কলিকাতা গিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় একমাত্র ধৈর্য ও অধ্যবসায় বলে উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছান যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার—শ্রীমান সন্তোষকুমার তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

—আউর সব 'নন্দ' কো লে আও—

কথাটি বলিয়া ছিলেন দিনাজপুর জেলার পুলিস সুপার। আমাদের ছাড়িয়া আসা রতনদিয়া গ্রামের 'দারোগা বাড়ী' বা 'বাঘ-ওয়ালা বাড়ী 'বলিতে বুঝায় মুখুজ্যে বাড়ী। একই জেলায় (দিনাজপুর) দুর্গানন্দ, যাদবানন্দ, বরদানন্দ (ইঁহাদের পূর্ববর্তী পুরুষ পরমানন্দ) দারোগা ছিলেন এবং তাঁরা এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন যখন সুখদানন্দকে পুলিস লাইনে ভর্তি করিতে যান, তখন পুলিস সুপার খুব আনন্দের সহিতই বলিয়াছিলেন 'আউর সব 'নন্দ'কো লে আও' (অর্থাৎ তোমাদের পরিবারে যে সব 'নন্দ' কাজ করিতে চায়, সবাইকে নিয়া আইস, চাকুরি দেব)। সাহেব বুঝিয়াছিলেন—নামের শেষে যখন 'নন্দ' আছে, 'নন্দ'ই উহাদের নামের পরিচায়কে।

আগেকার দিনে এমন অনেক পুলিস লাইনে সব-ইনস্পেকটর বা ইনস্পেকটর কাজ করিয়া গিয়াছেন যাঁরা ইংরাজী জানিতেন না—অথচ কর্মদক্ষতা এমন ছিল যে তাঁদের নামে জেলা কাঁপিত। ইঁহাদের তিন জনের (দুর্গানন্দ, যাদবানন্দ, ও বরদানন্দ) যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমি যখন ছোট, তখন দুর্গানন্দকে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর অধাঙ্গ অবশ হইয়া শয্যাশায়ী থাকিতে দেখিয়াছি। যাদবানন্দের পুত্র সন্তান ছিল না, কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লমুখীকে বেশ ধুমধামের সহিতই বিবাহ দেন সাতারাড়িয়া (পাবনা) গ্রামের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। শ্রীমতী প্রফুল্লমুখীর বিবাহ হয় আমার বিবাহের কিছু পরই। তারকনাথ দিনাজপুর জেলায় খামসামা-তে স্কুলের শিক্ষক, পোষ্ট মাস্টার ইত্যাদি কাজ করিয়া সংসার চালাইতেন। শ্রীমতী প্রফুল্লমুখীর সুষ্ঠু পরিচালনায় সংসারে কোন অভাব ছিল না। যে কয়টি পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন তারকনাথ—তারা সকলেই বিদ্যার্জন করিয়া আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী তাহাদিগকে যে ভাবে চালাইতেছেন সেই

ভাবেই চলিতেছে আনুগত্যের সহিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তখনকার দিনেও প্রফুল্লমুখী অধ্যবসায় ও আন্তরিক চেষ্টার ফলে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার সহিত আমার পত্র বিনিময় হয়, তার বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষা দেখিয়া মুগ্ধ হই। আজকালকার গ্রাজুয়েটরা ঐরূপ বাংলা ভাষায় পত্র লিখতে পারে কিনা—সন্দেহ।

বরদানন্দ ছিলেন কর্মদক্ষতায় অতুলনীয়। পুলিস বিভাগে কার্যকালে যেমন সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন—অবসর গ্রহণের পর রতনদিয়া নিজবাড়ীতে বসবাস কালেও কার্য দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দেন এবং জনপ্রিয় হইয়া ওঠেন। রতনদিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপনের সময় হইতে উহাকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা কালে যে কজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে বরদানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন খুব আমুদে লোক। তিনি অল্পবয়স্কদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতেন এবং তাদের যাবতীয় কৌতুকপ্রদ কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁর তিন পুত্র—জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ। জ্ঞানেন্দ্র ও নরেন্দ্র উভয়েই পুলিস বিভাগে চাকুরি পান কিন্তু তাঁরা অল্প দিন মধ্যেই কাজ ছাড়িয়া দেন। নরেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর রতনদিয়া বাজারে পাটের ব্যবসা করেন পরে আসামে গিয়া জমি, জমা, বাস গৃহ করিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। এখনও বৎসরের অধিকাংশ কাল আসামেই কাটান। ইঁহার তিন পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ। স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্ব হইতেই নৈহাটি আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং সেখানেই ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র দুটি রেশন সপের ডিলার এর কাজ পান, সর্ব কনিষ্ঠ উপেন্দ্র আসামে রেল বিভাগে চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন। ধীরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—এবার এম-এ পরীক্ষা দিয়াছে।

অতি বেদনা দায়ক ও রহস্য জড়িত দুর্ঘটনা হইতেছে বরদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু। তাঁহার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথের সহিত তিনি ঝরিয়া যান, তারপর হইতে পিতা পুত্র কেহই দেশে ফেরেন নাই। তৎপর শুনিয়াছি বরদানন্দ কলিকাতায় মারা যান। মণীন্দ্র নিখোঁজ। তাঁর স্ত্রী পুত্র ফুলিয়াতে বসবাস করিতেছেন। মণীন্দ্র ছিলেন আমার

জন্মে। তখন তাঁর দিব্যজ্ঞান জন্মে এবং মনে দৃঢ় ধারণা হয়—ভগবৎ ইচ্ছায় সবই হইতে পারে—'নচ দৈবাৎ পরং বলং।' ঘটনাটির (লক্ষ্মীঠাকুরাণীর আবির্ভাব) সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত থাকিলাম—তবে তিনি যদি তাঁহার অশেষ ভাগ্য বলে লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে সত্যই জল হইতে আবির্ভূতা হইতে দেখিয়া থাকেন তবে তাঁহার মত ভাগ্যবান কে? তাঁহার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। তিনি যাহা পাইয়াছেন, তাহার কাছে অর্থ কোন ছার! এই ঘটনার পর হইতে উক্ত মৎস্যজীবীর নাম রটিয়া যায়—"মালো ভাগ্যবান।" [পূর্ববঙ্গে মৎস্যজীবীরা 'হালদার', 'মালো'—প্রভৃতি নামে পরিচিত]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল—"এক মেথরের দিব্যজ্ঞান-লাভ"-এর কথা।

কোন এক মেথর (হরিজন) সম্রাটের অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া এক বেগমকে দেখিয়া এতই মুগ্ধ হয় যে সে আর চোখ ফিরাইতে পারে না। তারপর বাড়ী গিয়া শয্যা গ্রহণ করে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। তাহার স্ত্রী অনেক প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারে। মেথর বলে "তুই-ই আমাকে বাঁচাইতে পারিস—যদি বেগমকে একবার আমাকে দেখাইতে পারিস।" মেথরাণী বলে—"ঐ কথা বলিলে গর্দান নেবে।" যাহা হউক শেষ পর্যন্ত সে বেগম সাহেবাকে তার স্বামীর প্রার্থনা জানায়। বেগম তাহাকে পরামর্শ দিয়া বলেন—"তোর স্বামীকে গিয়া বল সে যেন সাধুর বেশ ধরিয়া পুষ্করিণীর চালায় বটগাছের তলায় ধ্যানে মগ্ন থাকে। এই নে কটি মোহর; উহা যেন তার সম্মুখে স্থানে স্থানে পুতিয়া রাখে। সম্রাটকে লইয়া আমি যাইব। সম্রাট টাকা মোহর দিতে চাহিলে যেন না লয়, যেন বলে 'উসব ঝুটা হ্যায়' যে মোহর পোতা থাকিবে তাহাই যেন চিমটা দিয়া খুঁচাইয়া সম্রাটকে দেখাইয়া দেয়। সম্রাট তখন বুঝিবেন টাকা মোহরের প্রতি সাধুর লোভ নাই। ঐখানে সে আমার দেখা পাইবে—বুঝিলি!" তাহাই করা হইল। সম্রাট বেগমসহ গেলেন এবং সাধুকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু মেথর আর বাড়ী যাইতে চাহেনা। সে ঐ কুটীরেই পড়িয়া থাকিল, মেথরাণীর সাধ্য সাধনা ব্যর্থ হইল। মেথরের দিব্য জ্ঞান আসিয়া গিয়াছে —তার ধারণা জন্মিয়াছে এই সামান্য ছদ্মবেশেই যদি সম্ভব হয় বেগম-সম্রাটকে রাজপ্রাসাদ হইতে আকর্ষণ করিয়া এখানে লইয়া আসা আমার মত ঘৃণ্য ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে, তাহা হইলে একান্ত মনে সেই ভগবানকে